ক্যারোলি ইরেকি

একাদশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি (BIOTECHNOLOGY)

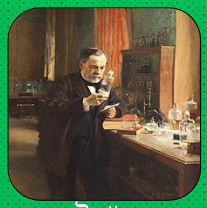

লুই পাস্তর

ভূমিকা (Introduction) : জীববিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত আন্তঃক্রিয়া হলো জীবপ্রযুক্তি। জীবপ্রযুক্তি হলো জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রয়োগমুখী শাখা। জীবপ্রযুক্তির উৎপত্তিকাল অতি প্রাচীন। অ্যাসিরিয়গণ ২৫০০ খ্রি. পূ. সময়ে টক দই তৈরি করতো। আরো পূর্বে চীনে (৭০০০ খ্রি. পূ.) এবং সুমেরীয় ব্যাবিলনীয়রা (৬০০০ খ্রি. পূ.) ঈস্ট দিয়ে গাঁজন করে অ্যালকোহল তৈরি করতো। তাই গাঁজন হলো জীবপ্রযুক্তির আদি ভিত্তি। বিভিন্ন ব্যাক্তি কর্তৃক (৬০০০ খ্রি. পূ.) ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে টক দই এবং পনির তৈরি করতো। এগুলো ছিল খুব সহজ জৈবপ্রযুক্তি। খ্রিস্টের জন্মলগ্নে অ্যাসিবিয়রা পানি গরম করার কাজে বায়োগ্যাস ব্যবহার করতো। ৫০০ খ্রি. পূ. চীনে বিষফোঁড়ার উপর প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে moldy soybean curd ব্যবহার করতো।

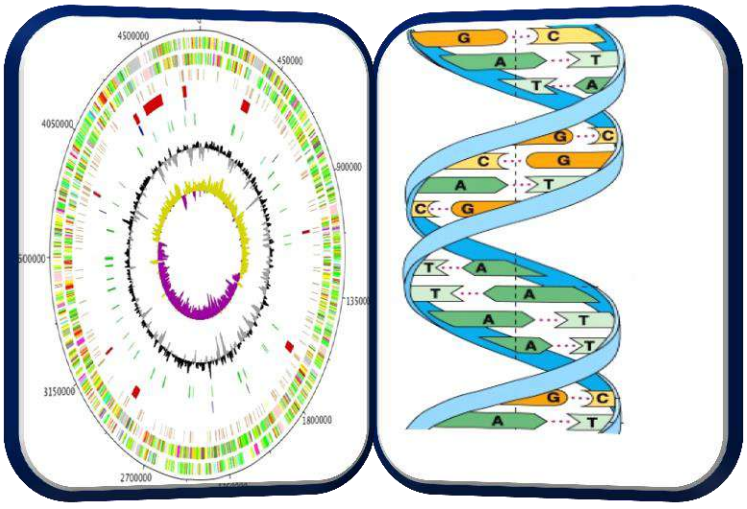

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীবপ্রযুক্তির অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বিশ্বউন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। বলা হয়ে থাকে যে, এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির (science & technology) যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে দেশ যতটা উন্নত সে দেশ অর্থনীতি, যোগাযোগ ও শক্তিতে ততটা উন্নত। ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী Karl Ereky সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি ব্যবহার করেন। Biology এবং Technology শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে Biotechnology নামক বিশেষ অর্থবোধক শব্দটি। জীবপ্রযুক্তির বহুমুখী সাফল্য ও সম্ভাবনা বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে বিবেচিত। জীবপ্রযুক্তি মানবকল্যাণ ও অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য অমিত সম্ভবনার সৃষ্টি করেছে, যা মানুষের কল্পনাশক্তিকেও হার মানায়। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উন্নত উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করেছে। অ্যান্টিবায়োটিক ও টিকা উৎপাদন, রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বায়োগ্যাস প্রযুক্তি জ্বালানি সমস্য নিরসন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ১৯৭০ সালে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ (Recombinant DNA) প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। যা মানব সভ্যতার রূপায়নে নতুন দিগন্তের দুয়ার খুলে দিয়েছে। আধুনিক কৃষিতে বায়োটেকনোলজির প্রয়োগকে Green Biotechnology বলে।

কোলম্যান (১৯৬৮) এর মতে **"বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত নীতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করে অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণিদের ব্যবহার করার মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তৈরির বিশেষ প্রযুক্তিকে জীবপ্রযুক্তি বলে"।**

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে (Learning Outcome)	পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)
১। জীবপ্রযুক্তির গুরত্ব ও সম্ভবনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-১ : টিস্যু কালচার।
২। টিসু কালচার প্রযুক্তির ধাপসমুহ বর্ণনা করতে পারবে।	পাঠ-২ : টিস্যু কালচারে প্রযুক্তির ব্যবহার।
৩। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।	পাঠ-৩ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।
৪। জিন ক্লোনিং ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-৪ : কৃষিক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার।
৫। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-৫ : চিকিৎসা ও ওষুধ শিল্পে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার্।
৬। জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-৬ : পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার।
৭। জীবপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুকির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।	পাঠ-৭ : জিন ক্লোনিং।
	পাঠ-৮ : জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ।
	পাঠ-৯ : জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভবনা।
	পাঠ-১০ : জীব নিরাপত্তা নির্দেশিকা।

প্রধান শব্দ (Key words) : বায়োটেকনোলজি, টিস্যু কালচার, এক্সপ্লান্ট, ক্যালাস, মাইক্রোপ্রোপাগেশন, সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন, প্লাজমিড, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ (DNA), ভেক্টর, পোষক, ইন্টারফেরন, ট্রান্সজেনিক জীব, জিন ক্লোনিং, জিন থেরাপি, জিন ম্যাপ, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিনোম সিকোয়েন্সিং, ইনসুলিন, গোল্ডেন রাইস, রেসট্রিকশন এনজাইম, ফিঙ্গার প্রিন্টিং।

জীবপ্রযুক্তির বিকাশ ও ইতিহাস (Development of Biotechnology & its History) : সময়ের পরিক্রমায় মানুষ যেমন দুধ থেকে দই, কিংবা ছানা উৎপাদন, শর্করা থেকে গাঁজন মদ তৈরি, গুড় থেকে ভিনেগার তৈরি, আবার অণুজীব থেকে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করে আসছে। তেমনি বর্তমান জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক জীব উৎপাদন, কৃত্রিমভাবে জিন উৎপাদন, পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়ার মাধ্যমে DNA তথা জিনের প্রতিলিপি গঠন বা অণুজীবকে কাজে লাগিয়ে মানুষের ব্যবহার উপযোগী প্রোটিন উৎপাদন করছে। বিভিন্ন গবেষণা ও আবিষ্কারের সাথে সাথে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিস্তার লাভ ঘটেছে। উপরের আলোচনায় জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অন্যতম আলোচিত আধুনিক শাখার নাম হলো জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology)। বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) শব্দটি ১৯৭০ সাল থেকে সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও প্রচারিত হয়ে থাকলেও এর ব্যবহার সেই প্রাচীনকাল থেকে।

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ বছর আগে সুমেরিয়ান ও ব্যাবিলীয়নরা নানান উপজাত পদার্থ উৎপাদন করতো এবং তখন থেকেই জীবপ্রযুক্তির ব্যাবহার শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগে মিশরীয়রা এক ধরনের পাউরুটি (baking leavened bread) তৈরি করতো যা জীবপ্রযুক্তির এক উপাদান। পরবর্তীতে বিজ্ঞানের প্রসার, গবেষণা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তির বিকাশ লাভ করে। মূলত ১৯৭০ সালের পর থেকে জীবপ্রযুক্তি মানব কল্যাণের একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

হাঙ্গেরীয় ইঞ্জিনিয়ার Karoly Ereky ১৯১৯ সালে Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন বলে ধারনা করা হয়। ইংল্যান্ডের লীডস সিটি কাউন্সিল ১৯২০ সালে Biotechnology শব্দের প্রথম ব্যবহার করে বলে মনে করা হয়, এরা Institute of Biotechnology স্থাপন করে এবং বিজ্ঞানী Louis Pasteur সর্বপ্রথম অণুজীবের সাহায্যে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করেন বলে তাকে Father of Biotechnology হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জীবপ্রযুক্তিকে দুই ভাবে আলোচনা করা যায়। যথা- প্রথাগত বা পুরাতন জীবপ্রযুক্তি (Traditional or Old Biotechnology) এবং নতুন বা আধুনিক জীবপ্রযুক্তি (New or Modern Biotechnology)। প্রথাগত বা পুরাতন জীবপ্রযুক্তি হলো প্রচলিত কৌশল প্রয়োগ করে অণুজীব বিশেষ করে কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক ব্যবহার করে বিয়ার, ওয়াইন, ঘি, দধি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা। আর পুরাতন জীবপ্রযুক্তি পদ্ধতির আধুনিক উন্নয়নের পাশাপাশি রিকম্বিনেন্ট DNA ও কোষীয় মিশ্রণ (cell fusion) কৌশলের মাধ্যমে জেনেটিক রূপান্তর (genetic modification)-এর সফল পদ্ধতিই হলো নতুন জীবপ্রযুক্তি। অথাৎ রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অণুজীব ও অন্যান্য জীবের রুপান্তরের মাধ্যমে অধিক মূল্যবান ও কাংক্ষিত উৎপাদ তৈরি করা যেগুলো প্রাকৃতিকভাবে সংগ্রহ করা বা উৎপাদন করা প্রায় অসম্ভব। যেমন- অণুজীবের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন ধরনের হরমোন যথা- ইনসুলিন, সোমাটোস্টেনিন ইত্যাদি উৎপাদন করা। বিভিন্ন ধরনের প্রাণি ও উদ্ভিদের কোষ ও কোষীয় উপাদানের মাধ্যমে মূল্যবান উৎপাদ উৎপাদন করা। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি, টিস্যু কালচার, সেল ফিউশন প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নত জাতের শস্য প্রজাতি ও প্রাণি ব্রিড তৈরি করা ইত্যাদি সবগুলোই হলো আধুনিক জীবপ্রযুক্তি।

জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখা (Different branches of Biotechnology) : জৈবপ্রযুক্তির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ অনুসারে বিষয়টিকে নানান শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সেসব শাখার মধ্যে কিছু শাখা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- **প্রাচীন জীবপ্রযুক্তি (Old Biotechnology) :** যে পদ্ধতিতে কোনো অণুজীবকে ব্যবহার করে কেক, পাউরুটি, ভিনেগার ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়, তাকে প্রাচীন জীবপ্রযুক্তি বলে। যেমন- দুধ থেকে দই তৈরি এবং ঈস্টের ব্যবহার দ্বারা রুটি তৈরি ইত্যাদি।
- **আধুনিক জীবপ্রযুক্তি (Modern Biotechnology) :** যে পদ্ধতিতে জিনপ্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট উন্নত কোনো জীবকে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করা হয়, তাকে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি বলে। যেমন- টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।
- **বায়োইনফরম্যাটিক্স (Bioinformatics) :** জীবের জিনগত ও প্রোটিনস্থিত বিভিন্ন জটিল তথ্যের বিশ্লেষণ ও জীববিদ্যার বিবিধ সমস্য সমাধানের জন্য , কম্পিউটার সায়েন্স ও তথ্য প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারকে বায়োইনফরম্যাটিক্স বলে।
- **সবুজ জীবপ্রযুক্তি (Green Biotechnology) :** যে পদ্ধতিতে জিনপ্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন করা হয়, তাকে সবুজ জীবপ্রযুক্তি বলে। যেমন- Bt বেগুন, Bt তুলা, আলু ইত্যাদি।
- **নীল জীবপ্রযুক্তি (Blue Biotechnology) :** জীবপ্রযুক্তির যেসব প্রয়োগ জলমন্ডলের সাথে সম্পর্কিত, তাদের নীল জীবপ্রযুক্তি বলা হয়। যেমন- ট্রান্সজেনিক মাছ উৎপাদন।
- **শ্বেত জীবপ্রযুক্তি (White Biotechnology) :** যে পদ্ধতিতে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পকে পরিবেশবান্ধব করে তোলা হয়, তাকে শ্বেত জীবপ্রযুক্তি বলে। যেমন- ভিনেগার ও পনির উৎপাদন।
- **লোহিত জীবপ্রযুক্তি (Red Biotechnology) :** চিকিৎসাক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগগুলিকে লোহিত জীবপ্রযুক্তি বলে। যেমন- জিন থেরাপি কিংবা ভ্যাকসিন প্রয়োগ।
- **মাইক্রোবিয়াল জীবপ্রযুক্তি (Microbial Biotechnology) :** যখন কোনো অণূজীবকে (যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) আশ্রয় করে জীবপ্রযুক্তি সাধিত হয়, তখন তাকে মাইক্রোবিয়াল জীবপ্রযুক্তি বলে। যেমন- ট্রান্সজেনিক *E. coli* এর সাহায্যে ইনসুলিন উৎপাদন।
- **পরিবেশ-সংক্রান্ত জীবপ্রযুক্তি (Environmental Biotechnology) :** যে পদ্ধতিতে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অণুজীব দ্বারা পরিবেশগত দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত ও নান্দনিক রাখা যায় তাকে পরিবেশ-সংক্রান্ত জীবপ্রযুক্তি বলে।

জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব (Importance of Biotechnology) : সুদূর অতীত থেকেই জীবপ্রযুক্তি আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। বিগত দুই দশকে জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মানুষের স্বাস্থ্য, কৃষিক্ষেত্র ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের চাহিদা মেটাতে জীবপ্রযুক্তির জ্ঞানকে বর্তমানে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আর ভবিষ্যতে নতুন নতুন ক্ষেত্রে এ শাখার অবদান বাড়বে। নিম্নে কয়েকটি শিরোনামে জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভবনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

- **কৃষিক্ষেত্রে (In agriculture) :** উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ ও অধিক উৎপাদনক্ষম প্রাণি সৃষ্টির মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তি কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো- ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণি উৎপাদন, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উদ্ভিদের প্রজনন, কীটপতঙ্গ, বালাই ও আগাছা প্রতিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদন, অধিক সালোকসংশ্লেষণক্ষম, নাইট্রোজেন সংবন্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারনক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন, বেশি দুধ ও অধিক মাংস উৎপাদনকারী সুস্থ্য ও সবল গবাদী পশু উদ্ভাবন, ট্রান্সজেনিক প্রাণিদের বায়ো-রিঅ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- **চিকিৎসাক্ষেত্রে (In medicine) :** জীবপ্রযুক্তির অবদান আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনস্বীকার্য। চিকিৎসাক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির বিশেষ অবদান হলো- *i.* রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ের উপকরণ উৎপাদন, *ii.* মানুষের বংশগতীয় ত্রুটিজনিত রোগ জিন থেরাপি দ্বারা নির্মূল করা, (iii). বায়োফার্মিং এর মাধ্যমে অন্য উদ্ভদ বা প্রাণিদেহে জিন স্থানান্তর করে মানুষের প্রয়োজনীয় শর্করা, প্রোটিন, অ্যালকোলয়েড, হরমোন, এনজাইম, এন্টিজেন, অ্যান্টিবডি উৎপাদন, (iv). গৃহপালিত পশুর রক্ত, মুত্র ও দুধ থেকে প্রযোজনীয় ওষুধ ও উপাদান উৎপাদন, (v) বিভিন্ন রোগের টিকা উৎপাদন, (vi). বিভিন্ন ওষুধের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

- **শিল্পক্ষেত্রে (In industry) :** জীবপ্রযুক্তি শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মানবকল্যাণে বহু প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো- (i). বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্য রাসায়নিক পদার্থ (যেমন- এনজাইম, জৈব এসিড, অ্যালকোহল ইত্যাদি) উৎপাদন। (ii). এনজাইম থেকে কোমল পানীয়ের জন্য মিষ্টিদ্রব্য উৎপাদন। (iii). আখের চিটাগুড় ও ভুট্টা থেকে ইথানল উৎপাদন। (iv). জাত্রোফা (*Jatropha curcas*) নামক উদ্ভিদ থেকে বায়োডিজেল উৎপাদন। (v). *Bacillus amiloliquefaciens* ও অন্যান্য অণুজীবের মাধ্যমে অ্যামিনো এসিড উৎপাদন।

- **পরিবেশ রক্ষায় (Protecting the environment) :** প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে জীবপ্রযুক্তির যেসব ব্যবহার দেখা যায় সেগুলো হলো- (i). নির্দিষ্ট অণুজীব ব্যবহার করে নর্দমার আবর্জনা, গৃহপালিত বর্জ্য, কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য এবং তেলের আস্তরণ অপসারণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা হয়। (ii). বায়ু দূষণ রোধে বায়োফিল্টার (bio filter), বায়োসেন্সর (biosensor), কম্পিউটারের জন্য বায়োচিপস (biochip) এবং সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বায়োকোষ (biocell) সৃষ্টি ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা যায়। (iii). জিন ব্যাংক তৈরি করে জীববৈচিত্র্য ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সুরক্ষা করা। (iv). অপচনযোগ্য প্লাস্টিক পচন উপযোগী করতে ট্রান্সজেনিক অণুজীব ব্যবহার হচ্ছে।

- **ভারী ধাতু নিস্কাশনে (In heavy metal extraction) :** আকরিক থেকে খনিজ পদার্থ আহরণে metal leaching নামক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। যেমন- *Thiobacillus ferroxidans* নামক ব্যকটেরিয়া কপার পাইরাইট হতে লোহা ও সালফারকে আলাদা করে দেয় যাতে সহজ উপায়ে কপার আহরণ করা যায়।

- **বায়োমাস থেকে জ্বালানি উৎপাদন (Fuel production from biomass) :** ফার্মেন্টেশন (fermentation) পদ্ধতির সাহায্যে পচনশীল জৈব পদার্থ (যেমন- গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, মলমূত্র, আবর্জনা, লতাপাতা, গৃহস্থলীর বর্জ্য ইত্যাদি থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা হয় যেগুলো জ্বালানিরুপে ব্যবহৃত হয়।

- **খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনে (Production of food and beverages) :** জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে গুণগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা হয়। যেমন- পাউরুটি, দই, চিজ, মাখন, মাশরুম, বিয়ার, ওয়াইন, একক কোষ সৃষ্ট প্রোটিন (যেমন- প্রোটিন, মাইক্রোপ্রোটিন) ইত্যাদি।

- **বিবিধক্ষেত্র (Miscellaneous fields) :** (i). মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে ভইরাস শনাক্তকরণ। (ii). বিভিন্ন জীবাণুকে জীবাণু অস্ত্রে ব্যবহার করে সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। (iii). DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট বা জিনোম সিকুয়েন্স ব্যবহার করে পিতৃত্ব, ধর্ষক, খুনি বা মৃতদেহ শনাক্তকরণ। (iv). উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎপত্তি ও জাতিজনি নির্ধারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ : ১। টিস্যু কালচার ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং উপর বাংলাদেশে কি কি সাফল্য রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

২। জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট কোন কোন উপাদান কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

জীবপ্রযুক্তির সম্ভবনা (Potential of Biotechnology) : বিশ্বপর্যায়ে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্য আধুনিক জীবপ্রযুক্তি দ্বারা সমাধান করা সম্ভব বলে আশা করা যায়। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনীতি জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে। কিছুক্ষেত্রে এর বিপ্লব সাধিত হবে, যেমন- কৃষি, চিকিৎসা, শিল্প ও পরিবেশ। একবিংশ শতাব্দীর জীবপ্রযুক্তির কয়েকটি সম্ভবনাময় ক্ষেত্র এখানে উল্লেখ করা হলো।

- **জিনোম স্ক্যানিং (Genome scanning) :** জিনোম স্ক্যানিং প্রযুক্তিতে স্বল্প খরচে ও স্বল্পসময়ে যেকোনো জীবের সম্পূর্ণ জিনোম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানা যাবে। এমনকি মানব ক্রোমোজোমে বিদ্যমান নিষ্ক্রিয় জিনের (প্রায় ৯৭%) বিভিন্ন তথ্যাদি উদঘাটন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- **জিন থেরাপি এবং আরএনএআই (Gene therapy and RNAi) :** বংশগতিয় রোগ, ক্যান্সার এবং কিছু সংক্রামক জটিল রোগের চিকিৎসায় জিন থেরাপির প্রয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনকে সুস্থ্য জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এসব জিনের বাহক হিসেবে ভাইরাস, RNAi, অ্যান্টিসেন্স বা জিঙ্ক ফিঙ্গার প্রোটিন ব্যবহার করা হয়।
- **স্টেম সেল (Stem cell) :** যেসব কোষ অবিভেদিত ও আজীবন বিভাজনক্ষম কোষে (যেমন- B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইট) রূপান্তরিত হতে পারে তাদের স্টেম সেল বলে। জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে এ ধরনের কোষ সৃষ্টি করে হারানো অঙ্গের প্রতিস্থাপন, যেকোনো অঙ্গের কোষ তৈরি, নতুন ওষুধের পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যাদি সহজতর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- **মাইক্রো আরএনএ (Micro RNA) :** ক্যান্সার, ভাইরাস সংক্রমণ, বিপাক সমস্যা এবং প্রদাহজনিত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মাইক্রো আরএনএ-এর ব্যবহার হতে পারে জীবপ্রযুক্তির এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এটি রোগ সৃষ্টিকারী জিনের কাজকে প্রতিরোধ করে।
- **ন্যানোটেকনোলজি (Nanotechnology) :** এ প্রযুক্তি দ্বারা পদার্থের আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের ইচ্ছামতো জৈব বস্তুর উৎপাদন করা যায়। এ প্রযুক্তিতে উৎপাদিত বস্তু দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য সেবা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
- **জিন ক্লোনিং (Gene cloning) :** জিন ক্লোনিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মানব কল্যাণে ব্যবহৃত অনেক উপাদান প্রস্তুত করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আরও অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **জিএম অণুজীব (GM microbe) :** জেনেটিক্যালি মডিফাইড অণুজীব ব্যবহার করে অনেক উন্নত দেশে পরিবেশের দূষণমাত্রা রোধের চেষ্টা চলছে। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে এদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্মল রাখার জন্য ও অধিকতর উৎপাদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হবে।

অদূর ভবিষ্যতে স্বল্প ব্যায়ে, দ্রুত সময়ে এবং কম দূষণমুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে জীবপ্রযুক্তি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকার সমস্যার সমাধানকে ত্বরান্বিত করবে, ফলে কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসায় আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আশা করা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন দিক আমাদের উন্নয়নে ও অর্থনৈতিক মুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং খুলে দিবে সুন্দর সম্ভবনাময় টেকসই ভবিষ্যতের নতুন দ্বার।

উদ্ভিদ টিস্যু কালচার (Plant Tissue Culture) : উদ্ভিদের কোন বিশেষ একটি কোষকে একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে রূপান্তরের ঘটনাটি যেমন চমৎকার তেমন বিস্ময়করও বটে। একটি উদ্ভিদের সামান্য প্রোটোপ্লাস্ট ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি ও রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উৎপাদন এখন আর নতুন কোনো ঘটনা না হলেও প্রকৃতপক্ষে, জীবজগৎ নিয়ে গবেষণার অনেক গভীরে এর প্রভাব।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণাগারে কাচের পাত্রে যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের কোন বিভাজনক্ষম অঙ্গ (যেমন- কান্ডের পর্ব, পর্বমধ্য, শীর্ষমুকুল, পাতার অংশ, কাক্ষিক মুকুল, মূল) উদ্ভিদদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পুন্ন জীবাণুমুক্ত কৃত্রিম পরিবেশে কালচার মিডিয়ামে আবাদের মাধ্যমে নতুন চারা উৎপাদন করা যায়, তাকে টিস্যু কালচার বা কলা আবাদ বলে। অথাৎ গবেষণাগারে কোন টিস্যুকে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করাই হলো টিস্যু কালচার।

আমেরিকান বিজ্ঞানী Morgan (১৯০১) সর্বপ্রথম প্রতিটি সজীব উদ্ভিদকোষের সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিনত হওয়ার অন্তনিহিত ক্ষমতা আছে বলে ধারনা প্রদান করেন এবং তিনি এ ক্ষমতাকে টটিপোটেন্সি (totipotency) নামে অভিহিত করেন। ১৯০২ খৃস্টাব্দে উদ্ভিদের বিচ্ছিন্নকৃত টিস্যু সফলতার সাথে পুষ্টি মাধ্যমে জন্মাতে সক্ষম হওয়ায় জার্মান বিজ্ঞানী Gottlieb Haberlandt কে টিস্যু কালচার পদ্ধতির জনক (Father of tissue culture) বলা হয়।

কাচ পাত্রের মধ্যে সম্পন্ন হয় বলে টিস্যু কালচার পদ্ধতিকে ইন-ভিট্রো (*In vitro*) কালচারাও বলা হয়ে থাকে। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা হয় এজন্য একে মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলা হয়। আবার এ প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন প্রজন্ম বা ক্লোন তৈরি করা হয় বলে একে ক্লোনিং প্রযুক্তিও বলা হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে মাতৃউদ্ভিদ হতে পৃথকীকৃত অংশকে এক্সপ্লান্ট বলা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন চারাকে অণুচারা (plantlet) বলা হয়।

টিস্যু কালচার, জীবপ্রযুক্তির একটি নতুন শাখা হলেও ইতোমধ্যে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজনন, উন্নত উদ্ভিদ প্রকরণ উৎপাদন এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই বিশেষ অবদান রাখতে শুরু করেছে।

টিস্যু কালচারের প্রকারভেদ (Types of tissue culture) : উদ্ভিদ দেহের কোন অংশকে কালচার করা হবে তার উপর নির্ভর করে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- ১। অঙ্গ কালচার, ২। মেরিস্টেম কালচার, ৩। ভ্রূণ কালচার, ৪। পরাগরেণু কালচার, ৫। পরাগধানী কালচার, ৬। ক্যালাস কালচার, ৭। মাইক্রোপ্রোপাগেশন, ৮। প্রোটোপ্লাস্ট কালচার প্রভৃতি।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপসমূহ (Process of tissue culture technology) : উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে টিস্যু কালচারের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও এ পদ্ধতির মৌলিক কার্যক্রম এক এবং অভিন্ন। টিস্যু কালচারের জন্যে নিম্নলেখিত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয় :

১। এক্সপ্লান্ট নির্বাচন (Explant selection) : টিস্যু কালচারের জন্য যে উদ্ভিদাংশ বা কোষ ব্যবহার করা হয় তাকে এক্সপ্লান্ট বলে। সঠিক এক্সপ্লান্ট নির্বাচন টিস্যু কালচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্ভিদের কোন অংশ এক্সপ্লান্টের জন্য নির্বাচন করতে হবে তা ঐ উদ্ভিদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণত কান্ডের শীর্ষ মুকুল, পার্শ্বমুকুলসহ পর্ব, পাতার অংশ ইত্যাদি এক্সপ্লান্ট হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এক্সপ্লান্ট নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মাতৃউদ্ভিদটি সতেজ, রোগমুক্ত ও উন্নতমানের হয়। এরপর মাতৃউদ্ভিদ থেকে জীবাণুমুক্ত ধারালো ছুরি দিয়ে এক্সপ্লান্ট কেটে নেওয়া হয়। পুষ্টি মাধ্যমে স্থানান্তরের আগে এক্সপ্লান্টকে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ব্রোমিন পানি বা ৭০% অ্যালকোহল ইত্যাদির যে কোন একটি ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

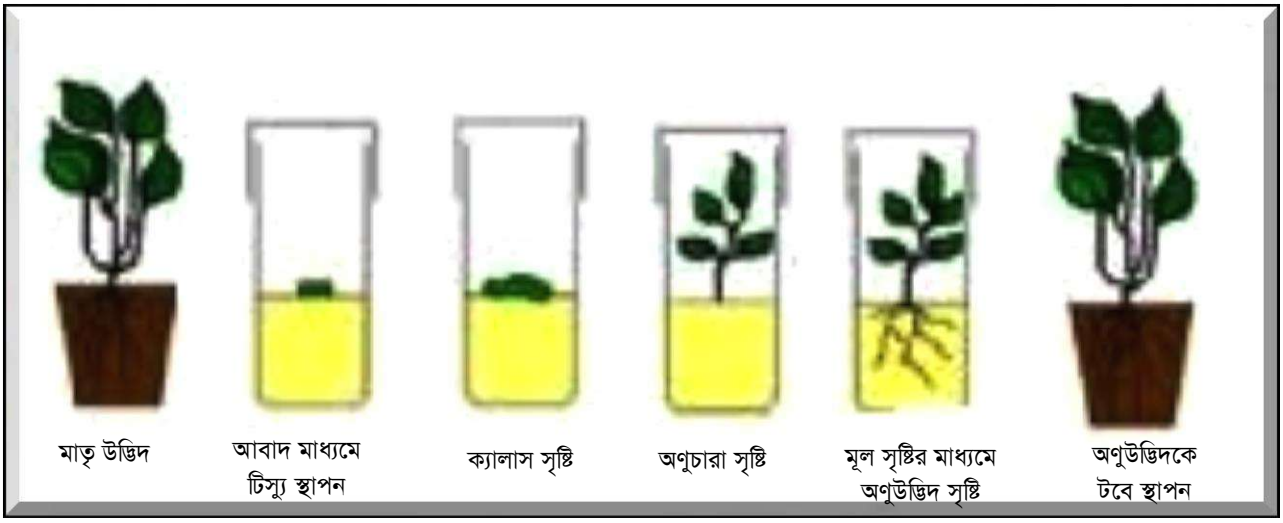

চিত্র : টিস্যু কালচার প্রযুক্তির বিভিন্ন ধাপ

২। পুষ্টি মাধ্যম তৈরিকরণ (Preparation of culture medium) : টিস্যু কালচারের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে পুষ্টি মাধ্যমের উপর। টিস্যু কালচারের জন্য কোন একক পুষ্টি মাধ্যম নেই। বিভিন্ন বিজ্ঞানী তাদের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন পুষ্টি মাধ্যমের সুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে MS মিডিয়াম (Marashige and Skoog, 1962) ও B_5 মিডিয়াম (Gamborg *et.al.*, 1968) সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। মূলত উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন হয় তার সমন্বয়েই পুস্টি মাধ্যম তৈরি করা হয়। মুখ্য ও গৌন পুষ্টি উপাদান, ভিটামিন ও কিছু জৈব যৌগ, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য, অ্যাগার অ্যাগার, কার্বনের উৎস হিসেবে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, মল্টোজ ইত্যাদির সমন্বয়ে পুষ্টি মাধ্যম তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য পুষ্টি মাধ্যমের pH নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা ৫।৫ – ৫।৮ এর মধ্যে রাখাই উত্তম। এসব মৌলিক পুষ্টি উপাদান-সমৃদ্ধ পুষ্টি মাধ্যমকে ব্যাসাল মিডিয়াম (basal medium) ও বলা হয়।

চিত্র : গবেষণাগারে ব্যবহৃত অটোক্লেভ যন্ত্র

৩। পুষ্টি মাধ্যম জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization) : কালচার মিডিয়ামে থাকে পুষ্টি উপাদান, ফলে এতে সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। কিন্তু কালচার করার জন্য মিডিয়াম এবং এক্সপ্লান্ট সবই জীবাণুমুক্ত থাকা আবশ্যক। তাই মিডিয়ামকে কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেস্ট টিউবে ঢেলে জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে বায়ু ঢুকতে না পারে। এরপর পাত্রটিকে জীবাণুমুক্তকরণ যন্ত্র (autoclave) দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। মিডিয়ামকে জীবাণুমুক্তকরণ যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপ (১২১° সে.), চাপ (১৫ পাউন্ড) ও সময় (২০ মিনিট) রাখা হয়। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে গবেষণাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট থেকে অণুচারা তৈরির পদ্ধতিই হলো ইন-ভিট্রো কালচার।

পুষ্টি মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট স্থাপন (Explant transfer into culture medium) : ইনোকুলেশন কক্ষে লেমিনার এয়ার ফ্লো কেবিনেটে ইনোকুলেশনের কাজ করা হয়। এ সময়ে ব্যবহৃত স্থান, যন্ত্রপাতি, ব্যবহারকারীর হাত ৭০% ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ইনোকুলেশনের সময় কালচার পাত্রের মুখ স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে উত্তপ্ত করে দ্রুত কটন প্লাগ খুলে জীবাণুমুক্ত চিমটার সাহায্যে এক্সপ্লান্ট প্রতিস্থাপন করা হয়। এরপর পাত্রের মুখ প্লাগবন্ধ করার আগে পুনরায় ল্যাম্পের সাহায্যে গরম করে নেওয়া হয়। এক্সপ্লান্ট প্রতিস্থাপনের সময় প্রতিবার ব্যবহৃত নিডল স্পিরিট ল্যাম্পে উত্তপ্ত করে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

৫। ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি (Callus formation and multiplication) : মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট তথা টিস্যু স্থাপনের পর কালচার পাত্র আবাদ কক্ষে নিয়ন্ত্রিত তাপ (২৫-২৭° সে.), আর্দ্রতা (৯০-১০০%) ও আলোকে (১০০০-৩০০০ লাক্স; লাল ও নীল বর্ণালী; ১৬ ঘন্টা প্রতিদিন) রেখে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে টিস্যুটি বিভক্ত হয়ে একটি অসংগঠিত ও নির্দিষ্ট অবয়বহীন কোষ পিন্ডে পরিনত হয়। একে ক্যালাস (callus) বলে। ক্যালাস থেকে একসময় অসংখ্য অণুচারা সৃষ্টি হয়।

৬। অণুচারা থেকে পূর্ণাঙ্গ চারা সৃষ্টি (Creation of full seedlings from micro-seedlings) : ক্যালাস হতে উৎপন্ন প্রতিটি অণুচারা পৃথক করে প্রতিটিকে এক একটি কালচার পাত্রে স্থাপন করা হয় এবং মাধ্যমে প্রয়োজনীয় হরমোন যুক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট হরমোন যুক্ত করার পর মূল ও কাণ্ড বিকাশ লাভ করে এবং পূর্ণাঙ্গ চারাগাছ সৃষ্টি হয়।

৭। টবে চারা স্থানান্তর (Transfer of plantlet to pot) : এ পদ্ধতিতে জন্মানো উদ্ভিদ বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশে সরাসরি অভিযোজিত হতে পারে না তাই পর্যায়ক্রমিক ধাপ অনুসরণ করে এগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানান্তর করা হয়। প্রথমে চারাগুলোকে টবে জীবাণুমুক্ত মাটিতে স্থানান্তর করে নিয়ন্ত্রিত স্থানে রাখা হয় এবং কয়েকদিন ধরে পরিমিত পানি দেওয়া হয়। এখানে ২৫+২° সে. তাপমাত্রা, ৯০-১০০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৮। প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ স্থানান্তর (Transfer plantlet to natural environment) : টবে কয়েক সপ্তাহ কক্ষের বাইরে রাখার ফলে চারাগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশে সহনীয় হয়ে উঠলে এবার এদেরকে আবাদি মাঠে রোপন করা হয়। এভাবে একখন্ড টিস্যু থেকে উৎপন্ন অসংখ্য সমাকৃতির চারা বছরের যে কোন সময়ে মাঠে লাগানোর উপযোগী করে উৎপাদন করা যায়।

টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার (Application of Tissue Culture Technology) : উদ্ভিদ প্রজননের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-অধিক ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধী ও উন্নত গুণ সম্পন্ন জাত উৎপাদন। আর উদ্ভিদ প্রজননের এ বিশেষ ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্ভিদ উন্নয়নে টিস্যু কালচারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। মাইক্রোপ্রপাগেশন (Micro propagation) : মাতৃ উদ্ভিদের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রেখে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যেক চারাগাছ উৎপাদন টিস্যু কালচার প্রযুক্তির একটি অন্যতম ব্যবহার। উদ্ভিদ অঙ্গের কোনো অংশ (plant part) নিয়ে পুষ্টি মাধ্যমে তার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে ক্ষুদ্রচারা বা প্লান্টলেট (plantlet) তৈরি করার পদ্ধতিকে মাইক্রোপ্রপাগেশন বলে। ফলজ, পুষ্প, ফসলি ও কাষ্ঠ উৎপাদনকারী প্রভৃতি উদ্ভিদের দ্রুত ও একই বয়সী অসংখ্য চারা উৎপাদন এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে, বিশেষ করে যাদের বীজ উৎপন্ন হয় না বা খুব কম হয়।

২। রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি (Disease free plant creation) : উদ্ভিদের বিটপের শীর্ষস্থ ভাজক কলা সাধারণত ভাইরাস বা অন্যান্য রোগজীবাণুমুক্ত থাকে না। শীর্ষস্থ ভাজক কলা আবাদ করে বেশ কিছু উদ্ভিদের রোগমুক্ত জাত উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন- টমেটো, গোলআলু, স্ট্রবেরি, শিম ইত্যাদি।

৩। সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন সৃষ্টি (Creating somaclonal variation) : আবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে অনেক সময় আবাদকৃত কোষ-টিস্যুর বিশেষ বংশগতীয় পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। একে সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন বলে। পছন্দসই কোনো বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হলে তা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়।

৪। উদ্ভিদ সংরক্ষণ (Plant conservation) : বর্তমানে অনেক বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ অল্প সময়ে উল্লেখিত উদ্ভিদ থেকে অধিক চারাগাছ উৎপাদন করা এ প্রযুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব।

৫। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি (Transgenic plant creation) : পছন্দসই বৈশিষ্ট্যের বহিরাগত জিন প্লাজমিডের সাহায্যে উদ্ভিদকোষের প্রোটোপ্লাস্টে প্রবেশ করিয়ে পুষ্টি মাধ্যমে রেখে তা থেকে চারা উদ্ভিদ তৈরি করে জমিতে স্থানান্তর করে পরিণত উদ্ভিদ সৃষ্টি ও চাষ উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে উন্নত পুষ্টিমান, পতঙ্গরোধী ও আগাছানাশক বিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদনে এক বিরাট বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে।

৬। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন (Haploid plant production) : পরাগরেণু এবং পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমুহ প্রজননের ক্ষেত্রে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হলে তা থেকে সহজেই ইস্পিত ডিপ্লেয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। চীনের বিজ্ঞনীগণ এ পদ্ধতিতে ধানের শতাধিক নতুন জাত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের হ্যাপ্লয়েড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

৭। মেরিস্টেম কালচার (Meristem culture) : মেরিস্টেম কালচার টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে মেরিস্টেম বলে। মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারাগাছ সাধারণত রোগমুক্ত হয়ে থাকে, কারণ মেরিস্টেম টিস্যুতে কোন রোগ-জীবাণু থাকে না।

৮। বন্ধ্যা উদ্ভিদের চারা উৎপাদন (Production of seedlings of infertile plants) : যেসব উদ্ভিদের স্বাভাবিকভাবে বীজ উৎপন্ন হয় না, সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া ভাল জাতের উদ্ভিদের অল্প সময়ে মাতৃগুণাগুণ বিশিষ্ট অধিক চারা উৎপাদন করার জন্য টিস্যু কালচার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৯। ভ্রূণ কালচার (Embryo culture) : টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক হলো ভ্রূণকালচার। ভ্রূণকালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে আন্ত :প্রজাতি সংকরের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ না করায় সংকর উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সংকরায়ণের পর ভ্রূণকালচার করা হয়। ফলে ভ্রূণ আর নষ্ট হয় না এবং পরবর্তীতে এ ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করে। এভাবে উৎপাদিত সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নতজাত উদ্ভাবন করা সম্ভব।

১০। আন্ত :প্রজাতির কৃত্রিম প্রজনন (Artificial insemination of inter-species) : ভ্রূণ কালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রজননের অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। বিশেষ করে আন্ত :প্রজাতির সংকরায়নে ভ্রূণের পূর্ণতা না পাওয়ায় সংকরায়ণের পর ভ্রূণ কালচার করা হয় এবং পরবর্তীতে এ ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করা হয়।

১১। দেহ কোষের সংকরায়ণ (Body cell hybridization) : দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট সংযোজন ঘটিয়ে সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। এভাবে আলু ও টমেটো থেকে পোমাটো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ওট ও ভুট্টা, গাজর ও তামাক উদ্ভিদসমুহে আন্ত :গণ ও সংকরায়নে প্রোটোপ্লাস্ট-প্রোটোপ্লাস্ট এবং প্রোটোপ্লাস্ট-সাইটোপ্লাস্ট মিলন ঘটিয়ে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১২। প্রোটোপ্লাস্ট মিলন বা ফিউশন (Protoplast fusion) : এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রোটোপ্লাস্ট সংযুক্তি এবং তা থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ সংকরায়ণের ক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের সময় পুংগ্যামেটে সাইটোপ্লাজম খুবই কম থাকে এবং তা স্ত্রী গ্যামেটের বাইরে রয়ে যায়। কিন্তু প্রোটোপ্লাস্টের মিলনে সোমাটিক হাইব্রিড উদ্ভিদ তৈরি হলে সেখানে দুটি প্রজাতির সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। এভাবে যখন দুটি কোষের মিলনে নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে না শুধু সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে তখন তাকে সাইব্রিড (cybrid) বলে। আলু ও টমেটো উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন করে সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদের নাম দেয়া হয়েছে পোমাটো ।

বাংলাদেশে টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Tissue Culture Technique in Bangladesh) :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ আশির দশকের প্রথম দিক থেকে টিস্যু কালচার নিয়ে কাজ শুরু করে। ক্রমে ক্রমে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ কাজ প্রসার লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে বেশ কিছু উদ্ভিদ নিয়ে টিস্যু কালচার গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

- বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশী অর্কিডের চারা উৎপাদন।
- কলার চারা উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষক পর্যায়ে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত চারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা রোগ প্রতিরোধক্ষম বলে উৎপাদনও ভালো।
- চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশন প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।
- কদম, জারুল, ইপিল ইপিল, সেগুন, নিম প্রভৃতি কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।
- বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় ফসল ও বাদামের টিস্যু কালচার।
- পাটের ভ্রূণ কালচার ও চারা উৎপাদন।
- টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে গোল আলুর রোগমুক্ত বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে টিস্যু কালচার বিষয়ক উন্নতমানের গবেষণা চলছে। উন্নতমানের বেলের চারা উৎপাদন এদের একটি সাফল্যজনক কাজ। শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরী ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী জার্মপ্লাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ। আকাশমনি উদ্ভিদের দ্রুতবর্ধনশীল ও কম সময়ে অধিকতর কাঠ উৎপাদনক্ষম চারা উৎপাদন এবং তরমুজের চারা উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাঁঠালের চারা উৎপাদনসহ আরো কিছু কাজ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে। তন্মধ্যে রোগমুক্ত গোলআলুর মাইক্রোটিউবার (আলুবীজ) উৎপাদন এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ। গোলাপ, গ্লাডিওলাস, লালপাতা ও নানা ধরনের অর্কিডের চারা উৎপাদন। ইপিল ইপিল, মেহগনি ও কেলিকদম ইত্যাদির কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে দেশী ও বিদেশী নানা প্রকার অর্কিডের চারা উৎপাদন, মুগ কলাই ও মাষ কলাই ডালের রোগ প্রতিরোধক্ষম চারা উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও বর্তমানে বহু প্রইভেট সংস্থা (NGO) তথা ব্রাক (BRAC) ও প্রশিকা কর্তৃক বিদেশী অর্কিড ও গোল আলুর চারা উৎপাদন ও বিপণন বাংলাদেশে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রসার ও সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Advantages and disadvantages of tissue culture method) : নিচে টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো-

সুবিধাসমূহ (Advantages) :

১। একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু চারা সৃষ্টি করা যায়।

২। সহজে রোগমুক্ত, বিশেষকরে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৩। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়া যায়।

৪। সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুত করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫। কলমে অক্ষম উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা যায়।

৬। অল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন করা যায়।

৭। উদ্ভিদের যে কোন কলা থেকে চারা উৎপাদন করা যায়।

৮। অতি সস্তায় বাণিজ্যিকভাবে চারা উপাদন সম্ভব।

৯। বিদেশী জাতের উদ্ভিদ থেকে দেশী আবহাওয়া উপযোগী জাত সৃষ্টি করা সম্ভব।

১০। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না সেগুলোর চারা প্রাপ্তি ও স্বল্প খরচে এবং দ্রুততার সাথে সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।

১১। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ পুন :উৎপান ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অসুবিধাসমূহ (Disadvantages) :

১। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হলো মূল্যবান যন্ত্রপাতি যেমন-ল্যামিনার ফ্লো, অটোক্লেভ ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো মূল্যবান হলেও অনেক সময় সহজে পাওয়া যায় না।

২। কোনো কারণে যদি মাল্টিপ্লিকেশনের সময় প্রাথমিক অবস্থায় আবাদকৃত টিস্যু জীবাণু দ্বারা (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক) আক্রান্ত হয় তবে বহুসংখ্যোক সম্ভাবনাময় চারা নষ্ট হয়ে যায়।

৩। সঠিকভাবে টিস্যু কালচার বা মাইক্রোপ্রোপাগেশনের কাজ করার জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয়।

৪। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো বেশ ক্ষুদ্রাকৃতির হওয়ায় এদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বেশ অসুবিধা হয়ে থাকে।

৫। উৎপন্ন চারাগুলো মাতৃ-উদ্ভিদের সমগুণাগুণ সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে না। এতে উদ্ভিদগুলো ভবিষ্যতে দুর্বল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার সমুহ সম্ভবনা থাকে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জীববিজ্ঞানের একটি নবীনতম ও প্রয়োগমুখী শাখা। এর মূল লক্ষ্য হলো কোনো কাঙ্খিত জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নতমানের নতুন জীবপ্রকরণ সৃষ্টি করা। প্রতিটি জীব তার নিজ অবস্থানে সহজাত ক্ষমতা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে ভালবাসে। মানুষ কোনো জীবের যে কোনো একটি কোষের জিনের মধ্যে অবস্থিত বৈশিষ্ট্যকে ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐ সহজাত ক্ষমতাকে নতুন ক্ষমতাসম্পন্ন জীবে রুপান্তরের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। মানুষ ব্যাকটেরিয়াকে এমনভাবে ব্যবহার করেছে যে এর মাধ্যমে ইনসুলিন, সোমাটোস্টানিন, সোমাটোট্রপিন, রোগ প্রতিরোধী টিকা, অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে। তাই বলা যায় ভৌত বিজ্ঞানের আধুনিক শাখা, কম্পিউটার বিজ্ঞান কিংবা মহাকাশ বিজ্ঞানের চেয়েও বিস্ময়কর এ শাখার নাম জিন প্রকৌশল।

কোনো জীব কোষ থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন (gene) বহনকারী DNA খন্ডাণু পৃথক করে ভিন্ন একটি জীব কোষের DNA এর সাথে জোড়া দিয়ে এতে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানোর কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলে। অর্থাৎ কোনো জীবের DNA-তে অন্য কোনো জীবের কাঙ্খিত DNA অংশ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। আর যে পদ্ধতিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর কার্য সম্পন্ন করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বা জিন ক্লোনিং (Gene cloning) বলে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে এক জীব থেকে অন্য জীবে কাঙ্খিত জিনকে স্থানান্তর করা হয়। যে জীবে জিনটি স্থানান্তর করা হয় সে জীবে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায়। এরূপ জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) বা GE (Genetically Engineered) বা ট্রান্সজেনিক (Transgenic) জীব। ১৯৭২ সালে Jackson, Symon ও Berg নামক তিন বিজ্ঞানী দুটি ভিন্ন সূত্র থেকে DNA খন্ড একত্রে জোড়া লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সূত্রপাত ঘটান। জিন প্রকৌশল সম্পর্কে সমকালিন বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (Stephen Hocking) যেমন বলেছেন, আমরা চাই বা না চাই জিন প্রকৌশলই হবে একুশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞান।

১৯৫১ সালে সায়েন্স ফিকশন লেখক Jack Williamson তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Dragon's Island-এ সর্বপ্রথম Genetic Engineering শব্দটি ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানী Paul Berg কে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জনক বলা হয়। তিনি ১৯৭২ সালে প্রথম ল্যামডা ফায ভেক্টরের সাহায্যে SV-40 (Smian Virus 40) থেকে একটি জিন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করান।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়া (Process of genetic engineering) : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো এক প্রকার জীবপ্রযুক্তি, যার মাধ্যমে কোনো নির্ধারিত জীবের জিনের পরিবর্তন করা হয়। নিম্নে এর বিভিন্ন কৌশল উল্লেখ করা হলো :

১। জিন সংযুক্তি (Gene fusion) : যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক জিন সংযুক্ত হয়ে একটি সংকর জীন সৃষ্টি করে, তাকে জিন সংযুক্তি বলে। যেমন- ক্যানসার সৃষ্টিকারী জিন (oncogene) এর সঙ্গে অন্য কোনো জিন সংযুক্ত করে ক্যানসার গবেষণায় এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়।

২। প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন (Protoplast fusion) : দুটি উদ্ভিদকোষের প্রোটোপ্লাস্ট সংযুক্ত হতে দিয়ে দুটি জিনের মিশণ ঘটানোকে প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন বলে। প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনের মাধ্যমে নিকটবর্তী দুটি প্রজাতির দ্বারা উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনের মাধ্যমে দুটি পৃথক গণভুক্ত Yest (*Candida* ও *Endomycopsis*) কে একত্রিত করা সম্ভব হয়েছে।

৩। জিন অ্যামপ্লিফিকেশন (Gene amplification) : কোনো জিনের একাধিক প্রতিলিপি গঠনের প্রক্রিয়াকে জিন অ্যামপ্লিফিকেশন বলে। যেমন- ব্যাকটেরিয়ার কোষকে কাজে লাগিয়ে এই পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন, অ্যামিনো এসিড উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

৪। হাইব্রিডোমা সৃষ্টি (Creation of hybridoma) : নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি প্রস্তুতকারী ()-লিম্ফোসাইট কোষের সঙ্গে মায়োলোমা অর্থাৎ ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের মিলন ঘটিয়ে সংকর কোষ সৃষ্টির পদ্ধতিকে হাইব্রিডোমা বলা হয়। Cesar Milstein ও Georges kohler, 1975 সালে হাইব্রিডোমা সৃষ্টির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

৫। রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) : কোনো প্রজাতির জীবের নির্দিষ্ট জিনকে অন্য এক প্রজাতির জীবের DNA-র সাথে সংযুক্ত করে মিশ্র বা হাইব্রিড DNA প্রস্তুত করা হয়, তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে।

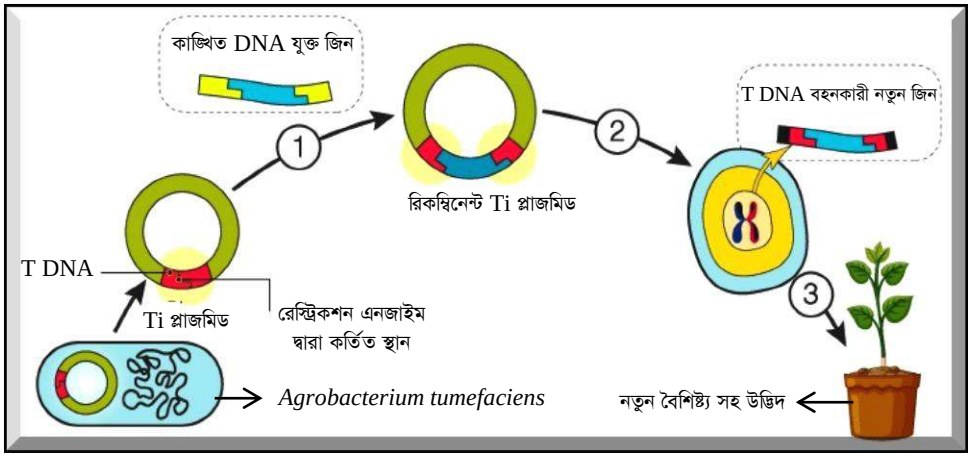

চিত্র : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি (Recombinant DNA Technology) : ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির কাঙ্খিত DNA খন্ডাণু নিয়ে তাকে অন্য একটি পোষক DNA এর সঙ্গে জোড়া দিয়ে যে সংকর DNA অণু সৃষ্টি করা হয়, তাকে পুনঃসংযোজিত বা রিকম্বিনেন্ট DNA বলে। রিকম্বিনেন্ট DNA অণু সৃষ্টির প্রযুক্তিকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলা হয়। সাধারণভাবে এ পদ্ধতিকে জেনেটিক ইঞ্জনিয়ারিং (Genetic Engineering) বা জিন ক্লোনিং (Gene Cloning) বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নিকট ও দূর সম্পর্কিত জীবের DNA-র মিশ্রণ ঘটিয়ে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানো হয়। ১৯৭২ সালে Jackson, Symon ও Berg নামক তিন বিজ্ঞনী দুটি ভিন্ন সূত্র থেকে DNA খন্ড একত্রে জোড়া লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করে DNA প্রযুক্তি বিষয়ের সূত্রপাত ঘটান। এ প্রযুক্তির স্বার্থক এবং বহুল ব্যবহার ইতিমধ্যে আমাদের জীবন ধারাকে (life style) পাল্টে দিতে শুরু করেছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত মৌলিক ধাপগুলো অবলম্বিত হয়।

১। কাঙ্খিত DNA নির্বাচন ও পৃথকীকরণ (Selection and segregation of desired DNA) : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হলো কাঙ্খিত DNA অণু পৃথকীকরণ। এজন্য কাঙ্খিত জীবের কোষকে লাইটিক এনজাইমের সাহায্যে গলিয়ে কোষস্থ পদার্থসমূহকে বের করা হয় এবং সেন্টিফিউজ করে DNA অণুকে (ব্যান্ড আকারে) পৃথক করা হয়। পৃথককৃত DNA কে রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আরও বিশুদ্ধ করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়।

২। বাহক DNA নির্বাচন (Selection of carrier DNA) : কাঙ্খিত DNA অণু (জিন) অন্য একটি বাহক (vector) অণুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয় যেন তা বাহক অণুর অংশ বলে মনে হয় এবং সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বাহকের সাথে সমান তালে বিভক্ত হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্ট কোষে প্লাজমিড (plasmid) থাকে। এটা নিউক্লিয়াস বহির্ভূত, ক্ষুদ্র বৃত্তাকার DNA যা উত্তম বাহক হিসেবে পরিচিত। এক্ষেত্রে *E. coli, Agrobacterium tumefaciens*-এর প্লাজমিড সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। প্রয়োজন অনুসারে প্লাজমিড DNA কে পরিবর্তন করে নেয়া হয়। বহুল ব্যবহৃত প্লাজমিড হলো pUC19 এবং তাতে অ্যাম্পিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন আছে। আবার অনেক সময় ভাইরাসের DNA বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩। কাঙ্খিত DNA-কে নির্দিষ্ট স্থানে কর্তন (Cutting the desired DNA to a specific location) : সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম প্রয়োগ করে কাঙ্খিত DNA-এর চাহিদামত অংশ কেটে পৃথক করা হয়। একই এনজাইম প্রয়োগ করে বাহক DNA-র নির্দিষ্ট স্থানে কেটে গ্যাপ তৈরি করা হয়। সাধারণত এভাবে ৪-৬ জোড়া ক্ষারক অংশ কেটে নেয়া থাকে থাকে। কাঙ্খিত ও বাহক উভয় DNA-র কাটা প্রান্ত গাঁথন প্রকৃতির (সম্পূরক একসূত্রী প্রান্ত) হয়। এমন প্রান্তকে আঠাল প্রান্ত বলে।

৪। রিকম্বিনেন্ট DNA অণু সৃষ্টি (Creation of recombinant DNA molecules) : কর্তিত DNA খন্ডকে বাহক DNA-র সাথে মিশ্রিত ভাবে রাখা হয়। মাধ্যমে লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করলে উভয় DNA-র আঠালো প্রান্তগুলো জোড়বদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্লাজমিডের কাঁটা অংশে কাঙ্খিত DNA খন্ড সংযুক্ত হয়ে পুনরায় বৃত্তাকার DNA সৃষ্টি হয়। এভাবে রিকম্বিনেন্ট DNA বা রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড তৈরি হয়।

৫। রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে পোষক কোষে প্রবেশকরণ (Insertion of recombinant DNA molecules into host cells) : সাধারণত সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য রিকম্বিনেন্ট DNA-কে পোষক কোষে প্রবেশ করানো হয়। যে জীব থেকে প্লাজমিড বা বাহক নির্বাচন করা হয় সেসব জীবই ভালো পোষক হিসেবে কাজ করে। মাধ্যমে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যুক্ত করে দ্রুত চাপ প্রয়োগ করলে ব্যাকটেরিয়া কোষ সহজেই প্লাজমিড গ্রহণ করে। DNA অণু প্রবেশের জন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো Electroporation। প্লাজমিড গ্রহণকারী ব্যাকটেরিয়াকে ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়া (transformed bacteria) বলে। উপযুক্ত আবাদ মাধ্যমে ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়।

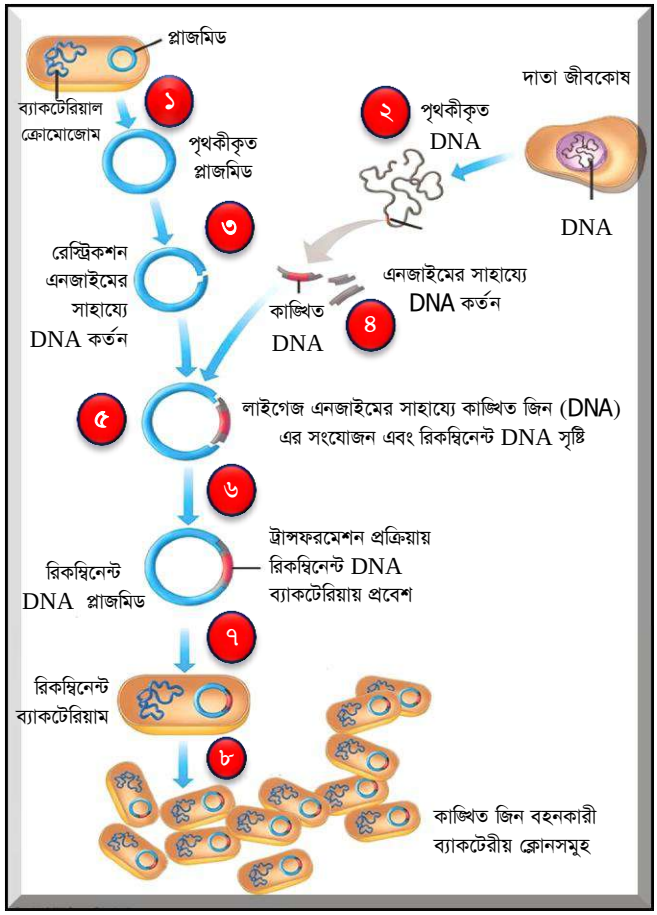

চিত্র : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ

৬। রিকম্বিনেন্ট DNA তে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন (Evaluation of the desired trait in recombinant DNA) : আবাদ মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধির পর কাঙ্খিত জিন সহ রিকম্বিনেন্ট DNA-র উপস্থিতির পরীক্ষা করানো হয়। সাধারণত প্লাজমিডের অ্যান্টিবায়োটিকরোধী দুটি জিনের মধ্যে একটিতে কাঙ্খিত DNA খন্ডটি যুক্ত করা হয়। যদি ব্যাকটেরিয়া কোষ দুটি অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত আবাদ মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে তাহলে সেক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি হয়েছে। অপরপক্ষে সফল রিকম্বিনেন্ট DNA বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়া শুধুমাত্র একটি অ্যান্টিবায়োটিক মধ্যমে বেঁচে থাকবে এবং যে অ্যান্টিবায়োটিকরোধী জিনের মধ্যে কাঙ্খিত DNA খন্ড যুক্ত করা হয়েছে সে অ্যান্টিবায়োটিকযুক্ত মাধ্যমে মারা যাবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে DNA প্রোব ব্যবহার করে দ্রুত রিকম্বিনেন্ট DNA শনাক্ত করা যায়।

৭। কাঙ্খিত জীবে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রতিস্থাপন ও ট্রান্সজেনিক জীবের মূল্যায়ন (Recombinant DNA transplantation in the desired organism and evaluation of transgenic organisms) : সফলভাবে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট DNA কাঙ্খিত জীবে প্রতিস্থাপনের বেশ কিছু পদ্ধতি আছে, যেমন- মাইক্রোইনজেকশন, ম্যাজিক বুলেট, জেনেগাম, ইলেকট্রোপোরেশন, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ইত্যাদি। এসব পদ্ধতিতে ডিম্বাণু বা ভ্রুণ কোষে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রতিস্থাপন করা হয়। এ কোষ হতে উৎপন্ন ট্রান্সজেনিক জীব (উদ্ভিদ, প্রাণি বা অণুজীব) সফল বলে বিবেচিত হয়।

প্লাজমিড (Plasmid) : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রধান জীবজ উপাদান হলো প্লাজমিড। প্লাজমিড এক ধরনের বৃত্তাকার DNA অণূ যা সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমে যে DNA থাকে প্লাজমিড তার বাইরে স্বাধীনভাবে পৃথক অণু হিসেবে অবস্থান করে। ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোজোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার বা রিং আকৃতির দ্বি-সূত্রক DNA থাকে তাকে প্লাজমিড বলে। এ জন্য প্লাজমিডকে বলা হয় extra chromosomal DNA। Laderberg (1952) *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাজমিডের সন্ধান পান। প্লাজমিড অল্পসংখ্যেক জিন বহন করে এবং এর কোষে বেশ কম সংখ্যেক প্রোটিন তৈরি হয়। যেগুলোর বেশিরভাগই সাধারণত কোষের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। প্লাজমিডের রেপ্লিকেশন স্বাধীনভাবে ঘটে এবং ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোমাল রেপ্লিকেশনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। রিকম্বিনেন্ট DNA-এর জন্য ভালো ভেক্টরের প্রায় সব গুণাবলই প্লাজমিডে আছে।

প্লাজমিডকে জিন প্রোকৌশলের প্রধান ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডকে ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক প্লাজমিডগুলো ভেক্টর হিসেবে ভাল কাজ করে না। এজন্য এদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য কোনো জিন প্রবেশ করিয়ে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। এ কাজের জন্য প্রথমে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে বৃত্তাকার প্লাজমিডকে নির্দিষ্ট এক বা একাধিক স্থানে কাটা হয়। পরে লাইগেজ এনজাইমের সাহায্যে এক বা একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য জিনকে (foreign gene) কাটা স্থানে সংযুক্ত করা হয়। এভাবে সৃষ্টকে রুপান্তরিত প্লাজমিড (modified plasmid) বলে। জিন প্রকৌশলে অতি ব্যবহৃত রুপান্তরিত প্লাজমিড হলো pBR 322 এবং pUC series।

প্লাজমিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General characteristics of plasmid) :

১। বৃত্তাকার দ্বি-সূত্রক DNA গঠিত স্বতন্ত্র জেনেটিক বস্তু।

২। ব্যাকটেরিয়ার মূল ক্রোমোজোম হতে ছোট ও আলাদা।

৩। অর্ধ-রক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় প্রতিলিপন ক্ষমতাসম্পন্ন।

৪। এটি এক ব্যাকটেরিয়া হতে অন্য ব্যাকটেরিয়োতে স্থানান্তর হতে পারে।

৫। এটি অন্য প্লাজমিড বা মূল DNA-র সাথে পুনঃসমন্বয় ঘটাতে সক্ষম।

৬। প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা আদর্শ প্লাজমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায়।

৭। কোনো কোনো প্লাজমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন- colicin, vibriocin ইত্যাদি।

৮। এর আণবিক ভর প্রায় $১০^৬$-২০০*$১০^৬$ dalton হয়ে থাকে।

৯। এটি অল্প সংখ্যেক জিন ধারণ করে থাকে।

প্লাজমিডের প্রকারভেদ (Types of Plasmid) :

১। কাজ অনুসারে (Basis of function) :

(ক) F এবং F‘ প্লাজমিড (F and F‘ plasmid) : এসব প্লাজমিড এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক উপাদান স্থানান্তর করার জন্য দায়ী।

(খ) R-প্লাজমিড (R-plasmid) : এদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জিন রয়েছে।

(গ) কোল প্লাজমিড (Cole plasmid) : এরা বিষাক্ত পদার্থ কোলিসিন উৎপাদন করার জন্য দায়ী।

(ঘ)। ডিগ্রেডেটিভ প্লাজমিড (Degradative plasmid) : এ ধরনের প্লাজমিডের উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ার টলুন, স্যালিসাইলিক এসিড ইত্যাদির অস্বাভাবিক উৎপাদন দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়।

(ঙ) ভিরুলেন্স প্লাজমিড (Virulence plasmid) : এগুলো হলো এক ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী প্লাজমিড।

২। সংখ্যা অনুসারে (Basis of number) :

(ক) সিঙ্গেল কপি প্লাজমিড (Single copy plasmid) : ব্যাকটেরিয়ার কোষে একটি মাত্র প্লাজমিড উপস্থিত থাকলে, তাকে সিঙ্গেল কপি প্লাজমিড বলে।

(খ) মাল্টিকপি প্লাজমিড (Multi copy plasmid) : ব্যাকটেরিয়া কোষে রেপ্লিকেশনের ফলে যখন অনেকগুলো (প্রায় ১০০০) প্লাজমিড সৃষ্টি হয়, তখন তাকে . মাল্টিকপি প্লাজমিড (multi copy plasmid) বলে।

প্লাজমিডের ব্যবহার (Uses of plasmid) :

- আণবিক বংশগতিবিদ্যার (molecular genetics) গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লাজমিড ব্যপকভাবে ব্যবহার করা হয়।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কাজে প্লাজমিড অত্যন্ত উপযোগী বাহক (vector) হিসেবে কাজ করে।
- প্লাজমিড DNA ব্যবহার করে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে; যেমন- মানুষের ইনসুলিন, জিন ক্লোনিং, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জিন ক্লোনিং (Gene Cloning) : ক্লোন (clon) শব্দের অর্থ হচ্ছে হুবহু প্রতিরূপ। একই বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন DNA খন্ডাংশ, কোষ বা জীবের হুবহু প্রতিরুপ দুটি সত্তাকে পরস্পরের ক্লোন (clon বলে। ক্লোন তৈরির পদ্ধতি ক্লোনিং (cloning) নামে পরিচিত। তাই জিন ক্লোনিং হলো কোনো জিনের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একাধিক প্রতিরুপ তৈরির পদ্ধতি বা কৌশল। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সকল কার্যক্রম জিনভিত্তিক আবর্তিত।

একটি ক্রোমোসোমের DNA-তে অসংখ্য জিন থাকতে পারে। এর সবগুলো কাঙ্খিত জিন নয়। কেননা, নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে, তাই প্রথমে কাঙ্খিত প্রোটিন খোঁজা হয় এবং ঐ প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন খুঁজে বের করতে হয়। সাধারনত বিজ্ঞানীগণ জীবের DNA-এর ক্যাটালগের জিন লাইব্রেরি তৈরি করেন এবং ঐ জিন লাইব্রেরি থেকে কাঙ্খিত জিন খুঁজে বের করেন।

কাঙ্খিত কোনো জিন একবার সনাক্ত করা গেলে তার প্রায়োগিক ব্যবহারের আগে বহুসংখ্যেক কপি তৈরির প্রয়োজন হয় যাতে তাকে ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। যেহেতু জিন স্থানান্তরের কাজ অত্যন্ত সুক্ষ্ম এবং এতে সাফল্যের হার অত্যন্ত সীমিত এজন্য বহুসংখ্যেক কপি নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজনিয় জিনটি যাতে কোনোক্রমেই হারিয়ে না যায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিনের ক্লোনিং তৈরি করা দরকার। অতএব বলা যায় যে, গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করার জন্য অথবা উন্নতমানের প্রোটিন তৈরির জন্যই হোক রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির একটি উদ্দেশই হলো বিশেষ জিনের বহু কপি তৈরি করা।

জিন ক্লোনিং-এর জন্য জিন-এর উৎস : তিনটি উৎস থেকে তা পাওয়া যায়-

i. বিনা ক্রাইটেরিয়ার (random) তৈরি ক্রোমোজোমের খন্ড যা ভেক্টর-এ অন্তর্ভূক্ত করা। এগুলো জিন লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

ii. সুনির্দিষ্ট mRNA থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনে করা কমপ্রিমেন্টারি DNA।

iii. গবেষণাগারে অর্গানিক কেমিস্টগণ কর্তৃক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত DNA খন্ড।

জিন ক্লোনিং-এর মূলনীতি (Principles of gene cloning) : জিন ক্লোনিং নিম্নলেখিত শর্তসাপেক্ষে সম্পন্ন হয়-

১। যেহেতু জিন কোনো DNA-এর সুনির্দিষ্ট অংশ বিশেষ যাতে বিশেষ নিউক্লিওটাইড সিকুয়েন্স উপস্থিত, সেকারনে জিন ক্লোনিং এর জন্য সুনির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড সিকুয়েন্স বিশিষ্ট DNA অণু খন্ডের প্রয়োজন।

২। জিন ক্লোনিং DNA অণুলিপনের মৌলিক নীতি মেনে চলে বলে প্রথমে ব্যবহৃত DNA খন্ডটি একসূত্রক বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। DNA replicase এনজাইমের প্রভাবে ক্লোনিং পর্যায়ে DNA এক সূত্রক অংশে পরিণত হয়। PCR প্রযুক্তিতে উচ্চ তাপ প্রয়োগে DNA সূত্র দুটি পৃথক করা হয়।

৩। DNA অনুলিপনের সময় কোষীয় মাধ্যম হতে চার প্রকার নিউক্লিওটাইড (A, T, C, G) ব্যবহার করে নতুন DNA সূত্র তৈরি হয় যা প্রাথমিক সূত্রটির পরিপূরক হিসেবে সংশ্লেষিত হয। DNA ক্লোনিং-এর জন্য ক্লোনিং মাধ্যমে অনুরুপ চার প্রকার নিউক্লিওটাইডের উপস্থিতি প্রয়োজন পড়ে।

৪। DNA সংশ্লেষণের ন্যায় জিন ক্লোনিং-এর জন্য DNA পলিমারেজ এনজাইমের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন হয়। DNA পলিমারেজ দ্বারা নতুন পরিপূরক সূত্রের সংশ্লেষণ ঘটে।

৫। লাইগেজ এনজাইম জিন ক্লোনিং-এর সময় নিউক্লিওটাইডসমুহের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে যা DNA সংশ্লেষণের অনুরূপ।

৬। নতুন সূত্রক সংশ্লেষণ প্রিমিয়ার সূত্রকের ৩©-৫© পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে অগ্রসর হতে থাকে, ফলে নতুন সূত্রকটি ৫© – ৩© হয়।

৭। পরিপূর্ণভাবে অনুলিপনের জন্য ক্লোনাধীন DNA কে একটি সম্পূর্ন DNA অণুর সাথে যুক্ত করা হয় এবং DNA অনুলিপনের সাথে সাথে এর স্বত :স্ফুর্ত অনুলিপন ঘটে এবং ক্লোন তৈরি হয়।

জিন ক্লোনিং এর মৌলিক ধাপসমুহ (Fundamental steps of gene cloning) : জিন ক্লোনিং করতে সুনির্দিষ্ট যে সকল পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয় সেগুলো হলো-

১। দাতা জীব থেকে কাঙ্খিত জিন (বা DNA) নির্বাচন ও আহরণ করা।

২। যে জিনকে ক্লোন করা হবে প্রথমে ঐ জিনকে বাছাই করা।

৩। ক্লোন জিন (বা DNA) এর বংশ বৃদ্ধিকরণ ও কাঙ্খিত জিনের বহিঃপ্রকাশ নিশ্চিতকরণ।

৪। কাঙ্খিত জিন (বা DNA) কে বহনকারী একটি বাহক নির্বাচন করা।

৫। এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইমের সাহায্যে কাঙ্খিত জিন (বা DNA) এবং বাহক DNA-কে সমমাপে কর্তন করা।

৬। পুনঃসংযোজিত জিন (বা DNA) বহনকারী বাহকের প্রতিলিপি করণের উদ্দেশ্যে একটি পোষক নির্বাচন করা।

৭। DNA লাইগেজ নামক এনজাইমের সাহায্যে কাঙ্খিত জিন (বা DNA) কে বাহক DNA-এর সাথে পুনঃসংযোজন করা।

৮। নির্বাচিত পোষকে পুনঃসংযোজিত জিন (বা DNA) বহনকারী বাহককে প্রবেশকরণ।

জিন ক্লোনিং কৌশল (Gene Cloning Techniques) : কাঙ্খিত জিনের অনেকগুলো রূপ সৃষ্টি করে জিনের চাহিদা পূরণে জিন ক্লোনিং এর যেসব কৌশল ইতিমধ্যে ফলপ্রসু বলে বিবেচিত হয়েছে এদের দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. ভেক্টর মাধ্যমে জিন ক্লোনিং, খ. PCR প্রযুক্তির সাহায্যে জিন ক্লোনিং।

১। ভেক্টর মাধ্যমে জিন ক্লোনিং (Gene cloning through vectors) : ব্যাকটেরিয়ার ভিতর কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের DNA প্রবেশ করিয়ে, DNA খন্ডটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় যাতে ব্যাকটেরিয়া সেই DNA-এর প্রতিলিপি গঠন করতে পারে। বর্তমানে জীবপ্রযুক্তিতে এ প্রক্রিয়াটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এ প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে আলোচিত হলো-

প্রথমে যে জিন বা DNA-এর ক্লোন করা হবে তাকে কয়েকটি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। এ জন্য রেস্ট্রিকশন এনজাইম (restriction enzyme) দিয়ে DNA-কে খন্ড খন্ড করে বিশেষ DNA বা DNA প্রোব (probe) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

এরপর উপযুক্ত বাহকের মধ্যে কাঙ্খিত জিন প্রবেশ করিয়ে রিকম্বিনেন্ট DNA গঠন করা হয়। এ কাজের জন্য লাইগেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ভেক্টর হিসেবে সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ব্যবহার করা হয়।

এরপর রিকম্বিনেন্ট DNA প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়া বা অন্য পোষক কোষে প্রবেশ করানো হয়। বেশ কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে- ক. ট্রান্সফেকশন, খ. ইলেকট্রোপোরেশন ও গ. লাইপোজোম।

এরপর রিকম্বিনেন্ট DNA সহ প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করেছে কি-না তা কতকগুলো রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয়। এ ধাপে বহিরাগত DNA যুক্ত প্লাজমিডসহ ব্যাকটেরিয়াকে উপযুক্ত মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির জন্য রাখা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে যে সংখ্যেক রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডের প্রতিলিপি উৎপন্ন হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ নির্বাচিত DNA বা জিনের ক্লোন গঠিত হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে ইন্টারফেরন, ইনসুলিন, বৃদ্ধি হরমোন ইত্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

২। PCR পদ্ধতিতে জিন ক্লোনিং (Gene cloning by PCR method) : রিকম্বিনেন্ট DNA ভেক্টর পৃথক করে পোষক দেহে প্রবেশ করানো হলে পোষকের সাথে কাঙ্খিত জিনের বিভাজন ঘটে। এরূপ অসংখ্য কপি তৈরি করা হয়। ১৯৮৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী Kary Mullis কোষ বহির্ভূতভাবে DNA ক্লোনিং এর দ্রুততম এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রযুক্তিকে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (Polymerase Chain Reaction) বা PCR কৌশল বলা হয়। ভেক্টর মাধ্যমে জিন ক্লোনিং-এ বেশ সময় লাগে। আর কাজটাও বেশ শ্রমসাধ্য এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার দাবিদার। তবে Kary Mullis এর আবিস্কৃত PCR প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত কোনো DNA টুকরাকে অল্প সময়ের মধ্যে বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায়। তবে এক্ষেত্রে অনেক বড় DNA খন্ড ব্যবহার করা যায় না।

PCR টেকনোলজিতে DNA রেপ্লিকেশনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি কাজে লাগানো হয়। এখানে দুটি সূত্রকের জন্য দুটি primer ব্যবহৃত হয়। primer এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে ৫'-৩' সূত্রকের সাথে যে primer যুক্ত হবে তা ৩'-৫'সূত্রক তৈরি করে এবং ৩'-৫' সূত্রকের সাথে যুক্ত primer ৫'-৩' সূত্রক তৈরি করে।

PCR পদ্ধতিটি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয়। যেমন-

ধাপ-ক : এ পর্যায়ে কাঙ্খিত DNA টুকরাকে ৯৫° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। ফলে DNA এর সূত্রকদ্বয় পৃথক হয়ে যায়। এর ফলে primer গুলো তাদের নির্ধারিত স্থানে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। এ ধাপকে বলা হয় denaturing step।

ধাপ-খ : খুব দ্রুত তাপমাত্রা ৪৫° সে. এ নামিয়ে আনা হয়। এর ফলে primer গুলো DNA সূত্রকের সাথে যুক্ত হয়। অবশ্য প্রকৃত তাপমাত্রা primer এর দৈর্ঘ্য এবং সিকুয়েন্স বিবেচনায় কম বেশী হতে পারে।

ধাপ-গ : এ ধাপেই বিক্রিয়াস্থলে থাকা নিউক্লিওটাইডগুলো ($dNTP_s$) Mg^{2+} আয়নের উপস্থিতিতে পরস্পর যুক্ত হয়ে নতুন সম্পুরক DNA সূত্রক তৈরি করে। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা ৭২° সে. রাখা হয়। উৎপন্ন DNA অণুকে তাপ দিয়ে আবার পৃথক করা হয়। এ পর্যায়ে পুনরায় primer ১.৫'- ৩' সূত্রক এবং primer ২.৩ – ৫ সূত্রকের সাথে যুক্ত হয়। দ্বিতীয় চক্র শেষে দুটি সূত্রক দুটি নতুন DNA তৈরি করবে। একইভাবে ৩-৫ সূত্রক থেকে প্রথম চক্রে যে DNA তৈরি হয়েছিল সেটিও নতুন দুটি DNA তৈরি করবে। এভাবে চক্রগুলো চলতে থাকে এবং প্রতিচক্রে DNA অণুর সংখ্যা হবে পূর্ববর্তী চক্রের দ্বিগুণ। সাধারণত বিক্রিয়াটি ২৫-৩৫ চক্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সুতরাং এক অণু DNA ৩৫ চক্র শেষে ২^{৩৫} (2^n) অর্থাৎ ৩.৫ ১০^{১০} অণু DNA তৈরি করবে যাদের প্রত্যেকেরই DNA সিকুয়েন্স এক।

চিত্র : PCR মেশিন

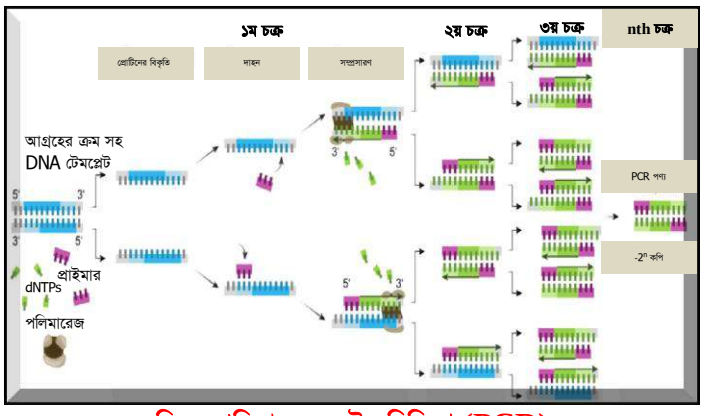

চিত্র : পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (PCR)

কৃষি ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার (Use of Biotechnology in Agriculture) : মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। কিন্তু সীমিত ভূখন্ডে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে কিভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায় কিংবা উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে অধিক লাভবান হওয়া যায় তা নিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে চলছে অবিরাম প্রতিযোগিতা। আর এ প্রতিযোগিতার প্রধান নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সফল জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ। কৃষিতে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার বহুমুখী। নিচে এই প্রযুক্তির কয়েকটি প্রয়োগিক ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

- **অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদন (Production of more productive grains) :** জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে অধিক সালোকসংশ্লেষণ, নাইট্রোজেন সংবন্ধন ক্ষমতাসম্পন্ন, অধিক পুষ্টিযুক্ত ফল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে অধিক ফলনশীল উদ্ভিদজাত উৎপাদন করা সম্ভব। এভাবে ধান, গম, ভুট্টা, তৈলবীজসহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- **গোল্ডেন রাইস সৃষ্টি (Creation of Golden Rice) :** গোল্ডেন রাইস বা সুপার রাইস হলো এক প্রকার বিশেষ ধরনের ট্রান্সজেনিক ধান, যাতে প্রচুর ভিটামিন A ও আয়রন থাকে। সুইস বিজ্ঞানী Ingo Potrykus ও জার্মান বিজ্ঞানী Peter Beyer ১৯৯৯ সালে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে *japonica* টাইপ ধানে ড্যাফোডিল উদ্ভিদের দুটি বিটা-ক্যারোটিন জিন ও আয়রন তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপন করে সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করেছেন। এ ধানের চালের ভাত খেলে শিশুরা ভিটামিন A ও আয়রনের অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত হবে না এবং মায়েরা দেহে রক্তশুন্যতার জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাবে। বর্তমানে সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস এর চাষ শুরু হয়েছে।
- **আগাছানাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি (Creation of herbicide resistant plants) :** বিভিন্ন ফসলী উদ্ভিদের মধ্যে আগাছানাশক (herbicides) প্রতিরোধী জিন প্রতিস্থাপন করে তাদের মধ্যে প্রতিরোধী ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে কাঙ্খিত উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন না করেই আগাছানাশক ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যায়।
- **রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন (Inventing disease resistant varieties) :** ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা রকম কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে এ প্রযুক্তি সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV) এর আক্রমণ থেকে তামাক গাছ প্রতিরোধী হয়েছে।
- **নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে (Nitrogen stabilization) :** লিগিউমোনাস জাতীয় উদ্ভিদের মূলে *Rhizobium* গণের ব্যাকটেরিয়া বায়ুস্থ নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে নডিউল (nodule) সৃষ্টি করে। এসব ব্যাকটেরিয়া হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন (nitrogen fixation) নিয়ন্ত্রক *nifH gene* ধান গাছের (*Oriza sativa*) ক্রোমোজোমে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে ধান গাছে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়াতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।
- **দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টি (Creation of radiant plants) :** জোনাকি পোকার আলোক বিচ্ছুরক লুসিফেরিন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে তামাক গাছে স্থানান্তর করে তাকে দ্যুতিময় করা হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক ঘরশোভা উদ্ভিদকে দ্যুতিময় করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
- **বীজহীন ফল সৃষ্টি (Seedless fruit production) :** অনেক দেশে বর্তমানে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বীজহীন ফল তৈরি করা হচ্ছে। যেমন– জাপানে বীজহীন আঙ্গুর, তরমুজ, কলা, লেবু উদ্ভাবন এ প্রযুক্তিরই প্রতিফলন।
- **নতুন প্রকরণ সৃষ্টি (Creating new variations) :** রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিতে নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন- রাই জাতীয় সরিষা থেকে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের জিন নিয়ে গমের কয়েকটি প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি (Transgenic plant creation) :** জৈবপ্রযুক্তিবিদগণের সাম্প্রতিক প্রকল্প হচ্ছে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ জাত সৃষ্টি করা। উদ্ভিদের জিনের গঠন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে উন্নত জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ জাত সৃষ্টি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
- **খনিজ পদার্থের যথাযথ ব্যবহার (Proper use of minerals) :** ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে মূল দ্বারা খনিজ পদার্থ শোষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পেলেও সার প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না।
- **গুণগত মান উন্নয়নে (Quality development) :** বর্তমানে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিজাত দ্রব্যের মান, গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভবপর হচ্ছে। বাংলাদেশ Bt বেগুন, Bt তুলা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার GM crop উৎপাদন হচ্ছে।
- **লবণাক্ততা সহনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি (Creation of salinity tolerant plants) :** জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে DPS Varma সোয়াবিন গাছ থেকে Pyroline-5-Carboxylase Synise জিনটি পৃথক করে তামাকগাছে সন্নিবেশিত করার পর দেখা গেল ঐ তামাকগাছ আগের চেয়ে ২০ গুণ অধিক লবণাক্ত জমিতে ভালোভাবে জন্মাতে পারে।
- **শৈত্য সহনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি (Creating of cold tolerant plants) :** জিন প্রকৌশলীরা বর্তমানে উত্তর মেরু অঞ্চলের ছোট ছোট মাছ থেকে শৈত্য প্রতিরোধক AF জিন পৃথক করে কাঙ্খিত ফসলে সংস্থাপিত করে শৈত্য সহনশীল টমেটো ও অন্যান্য ফসলের জাত সৃষ্টি করেছেন।

বিটি বেগুন

ফ্লেভার সেভার টমেটো

গোল্ডেন রাইস

ট্রান্সজেনিক ছাগল

চিকিৎসা ও ওষুধ শিল্পে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার (Use of Biotechnology in the Medical and Pharmaceutical Industries) : পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষই সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। অথচ প্রতি বছর জনসংখ্যা ও রোগের জটিলতা বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা সুবিধা সবার নিকট পৌছে দিতে বিজ্ঞানীরা জীবপ্রযুক্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে দ্রুত ওষুধ শিল্পের উন্নতি ঘটছে। মারাত্মক রোগ ব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ওষুধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হচ্ছে। বর্তমানে এ প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট প্রায় ৬০০ ধরনের ওষুধ ও ভ্যাকসিন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। নিচে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

- **ভ্যাকসিন উৎপাদন (Vaccine production) :** কোনো রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের দেহে প্রয়োগ করলে ঐ রোগের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ জন্মায় তাকে ভ্যাকসিন (vaccine) বা টিকা বলে। ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিদেহে রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা (immunity) জেগে উঠে। পূর্বে বিভিন্ন প্রাণিদেহ থেকে অ্যান্টিজেন পৃথক করে ভ্যকসিন উৎপাদন করা হতো। বর্তমানে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে প্রচুর ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হচ্ছে যা গুটিবসন্ত, জলাতঙ্ক, কলেরা, যক্ষ্মা, হাম, হেপাটাইটিস-বি প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বিট্রিশ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner) ১৭৯৬ সালে প্রথম গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন।
- **মানব ইনসুলিন উৎপাদন (Human insulin production) :** মানুষের ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসায় ইনসুলিন হরমোন ব্যবহার করা হয়। পূর্বে গরু ও শুকুরের অগ্ন্যাশয় হতে বাণিজ্যিকভাবে এ হরমোন সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন ব্যাকটেরিয়াতে স্থাপন করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়। ফলে এটি যেমন সহজলভ্য হয়েছে তেমনি এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও নেই।
- **মানব গ্রোথ হরমোন উৎপাদন (Production of human growth hormone) :** মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী সোমাটোট্রফিন হরমোন উৎপাদনকারী জিনকে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে জুড়ে দিয়ে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিকভাবে মানব গ্রোথ হরমোন উৎপাদন করা হয়। এ হরমোন বামনত্ব চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
- **এনজাইম উৎপাদন (Enzyme production) :** জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য হজমকারী বিভিন্ন এনজাইম , যেমন- জাইমেজ, প্রোটিয়েজ, লাইপেজ, ফাইসিন ইত্যাদি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয়।
- **ইন্টারফেরন উৎপাদন (Interferon production) :** ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন প্রোটিন যা ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই মানবদেহের অধিকাংশ কোষ ইন্টারফেরন উৎপন্ন করে। ইন্টারফেরন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। বর্তমানে *E. coli* ও ঈস্ট হতে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ইন্টারফেরন উৎপাদন করা হয় যা হেপাটাইটিস-বি, হার্পিস, জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন (Production of antibiotics) :** স্বল্পমাত্রার যেসব রাসায়নিক যৌগ অন্য এক বা একাধিক জীবাণুকে ধ্বংস বা জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিহত করতে সক্ষম তাদের অ্যান্টিবায়োটিক বলে। সাধারণত অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) হতে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে জীবপ্রযুক্তিতে প্রায় এক হাজারের মতো অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা হচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- penicillin, cephalosporin, amoxicillin, streptomycin, tetracycline ইত্যাদি।
- **জিন ধেরাপি (Gene therapy) :** সাধারণত জিনগত ত্রুটিজনিত কারণে কোনো রোগ দেখা দিলে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে ত্রটিমুক্ত জিন প্রবেশ করিয়ে রোগ নিরাময়কে জিন থেরাপি (gene therapy) বলা হয়। বর্তমানে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কোষ থেকে ত্রটিযুক্ত জিনকে সরিয়ে ফেলে সেই স্থানে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা হয়।
- **বংশগতীয় রোগ নিরাময়ে (Cure hereditary diseases) :** মানুষের বিভিন্ন রকমের বংশগতীয় (প্রায় তিন হাজার) রোগ রয়েছে। এদের মধ্যে এমন কিছু রোগ রয়েছে যা পিতামাতার যেকোনো একজনের থাকলে ৫০% সন্তান সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এ ধরনের বংশগত রোগকে autosomal dominant বলে। বর্তমানে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উক্ত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব।
- **মলিকুলার ফার্মিং (Molecular farming) :** রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ট্রান্সজেনিক প্রাণিদের বায়ো-রিঅ্যাক্টর (bioreactor) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এসব প্রাণি থেকে প্রাপ্ত দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা যায়। ওষুধ আহরণের এ প্রক্রিয়াকে মলিকুলার ফার্মিং (molecular farming) বলে।
- **বায়োফার্মিং (Biopharming) :** যখন ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বড় মাত্রায় উৎপাদন করা হয় তখন তাকে বায়োফার্মিং বলে। (i). জীবন রক্ষাকারী antihrombin এখন অতি অল্প খরচে ছাগলের মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে। (ii). GMO ছাগলের দুধ থেকে শক্তিশালী spider silk উৎপাদন করা হচ্ছে। (iii). ইনসুলিন এখন কুসুম ফুলের বীজের মাধ্যমে উৎপাদনযোগ্য হয়েছে। এতে খরচ খুবই কমে যাবে (এখনও উন্মুক্ত হয়নি)।

ভ্যাকসিন উৎপাদন

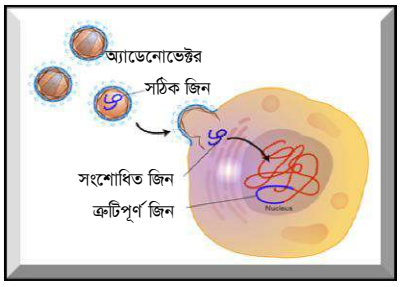

জিন থেরাপি

অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন

DNA প্রযুক্তিতে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন (Human Insulin Production in DNA Technology) : ইনসুলিন হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণির অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhance) গ্রন্থির বিটা (ß) কোষগুচ্ছ হতে ক্ষরিত হয়। এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{254}H_{377}N_{65}O_{75}S_6$ ও আণবিক ভর ৫৭৩৪। ইনসুলিন শর্করা বিপাক ঘটিয়ে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোন ক্ষরণ কমে গেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে মানবদেহে যেসব উপসর্গ দেখা যায় তাদের সামগ্রিকভাবে ডায়াবেটিস বলে। এরোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাইরে থেকে ইনসুলিন হরমোন গ্রহণ করতে হয়।

Sir Edward Sharpey–Schafer সর্বপ্রথম ১৯১৬ সালে ইনসুলিন আবিষ্কার ও নামকরণ করেন। রাসায়নিকভাবে ইনসুলিন হলো এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রোটিন। মানুষের ইনসুলিনে ১৭ ধরনের মোট ৫১টি অ্যামিনো এসিড থাকে। দুটি পলিপেপটাইড চেইন (A-চেইন ও B-চেইন) দু'টি ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি ইনসুলিন অণু গঠন করে। ইনসুলিনের A-চেইনে ২১টি অ্যামিনো এসিড, B- চেইনে ৩০টি অ্যামিনো এসিড থাকে। মানুষের ১১নং ক্রোমোজোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত ইনসুলিনের জেনেটিক কোড বিদ্যমান। এর মধ্যে ৬৩টি নিউক্লিওটাইড A-চেইন তৈরির জন্য এবং ৯০টি নিউক্লিওটাইড B-চেইন তৈরির জন্য দায়ী।

ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়া (Insulin production process) : ১৯৮১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার Hope National Medical Center-এর বিজ্ঞনীরা *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের সাহায্যে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশুদ্ধ মানব ইনসুলিন উৎপাদন করেন। নিম্নলেখিত কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে রিকম্বিনেন্ট DNA পদ্ধতিতে মানব ইনসুলিন উৎপাদন করা হয়।

১। ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্তকরণ (Insulin-producing gene identification) : মানবদেহে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনটির অবস্থান বর্তমানে শনাক্তকৃত। ১১নং ক্রোমোজোমের খাটো বাহুর শীর্ষ অংশের DNA-তে এই জিন অবস্থিত। এটি ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত। শিকল A তৈরিতে ৬৩টি এবং শিকল B তৈরিতে ৯০টি নিউক্লিওটাইড ব্যবহৃত হয়।

২। DNA সূত্র থেকে ইনসুলিন জিন অংশ পৃথককরণ (Isolation of insulin gene parts from DNA sources) : রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে মানব DNA থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ বিশেষ উপায়ে কেটে পৃথক করা হয়।

৩। বাহক প্লাজমিড পৃথককরণ (Carrier plasmid separation) : ইনসুলিন জিনকে বহন করার জন্য *E. coli* ব্যাকটেরিয়াম থেকে বিশেষ কৌশলে প্লাজমিড পৃথক করা হয়।

৪। *E. coli* প্লাজমিড DNA-এর একাংশ কর্তন (Cutting part of E. coli plasmid DNA) : রেস্ট্রিকশন এনজাই প্রয়োগ করে ইনসুলিন জিনের সমপরিমাণ প্লাজমিড DNA অংশ কেটে স্থান ফাঁকা করা হয়।

৫। প্লাজমিড DNA-তে ইনসুলিন জিন স্থাপন (Placement of insulin genes in plasmid DNA) : প্লাজমিড DNA-এর কর্তিত ফাঁকা স্থানে মানুষের ইনসুলিন জিন (DNA অংশ) বসিয়ে দেয়া হয় এবং লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাজমিড DNA এবং মানব DNA সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এর ফলে তৈরি হয় রিকম্বিনেন্ট DNA বা রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড। রিকম্বিনেন্ট DNA-তে জিনের সিকুয়েন্স সঠিক আছে কিনা তা PCR ও সিকোয়েন্সারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়।

৬। রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো (Inoculation of recombinant plasmid *E. coli* bacteria) : এরপর রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে পৃথক পোষক ব্যাকটেরিয়ামের (*E. coli*) দেহে ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করানো হয়, ফলে GM *E. coli* (Genetic modified *E. coli*) তৈরি হয়। হিট শক মেথড অথবা ইলেকট্রিক পালস মেথডে ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়।

৭। ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে GM *E. coli* সংখ্যাবৃদ্ধিকরণ (Increasing the number of GM *E. coli* in fermentation tank) : এবার GM *E. coli* তথা ট্রান্সজেনিক *E. coli* কে নির্দিষ্ট কালচার মিডিয়াযুক্ত ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ ট্রান্সজেনিক *E. coli* সৃষ্টি হয় এবং সাথে প্রতি কোষে উৎপাদিত ইনসুলিন জমা হয়।

৮। ইনসুলিন পৃথকীকরণ (Insulin isolation) : ইনসুলিন তৈরি হয়ে কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। তাই *E. coli* কোষসমূহকে lysis (বিগলিত) করে ইনসুলিন অহরণ করা হয়।

৯। ইনসুলিন বিশুদ্ধকরণ (Insulin Purification) : ব্যাকটেরিয়াকে বিগলন করার মাধ্যমে যে ইনসুলিন পাওয়া যায় তাতে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব অনেক প্রোটিনও থাকে। তাই আহরিত ইনসুলিনকে বিশুদ্ধ করা হয়।

বাজারজাতকরণ (Marketing) : উৎপাদন পরবর্তীতে উপযুক্ত এম্পুলে ভরে ইনসুলিন বাজারজাত করা হয় এবং ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সময়ে পেশিতে পুশ করা হয়। দেহে ইনসুলিন রক্তের সাথে প্রবাহিত হয়ে দেহকোষের মেমব্রেনে উপযুক্ত রিসেপ্টিভ সাইট তৈরি করে যার ফলে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভেতরে প্রবেশ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

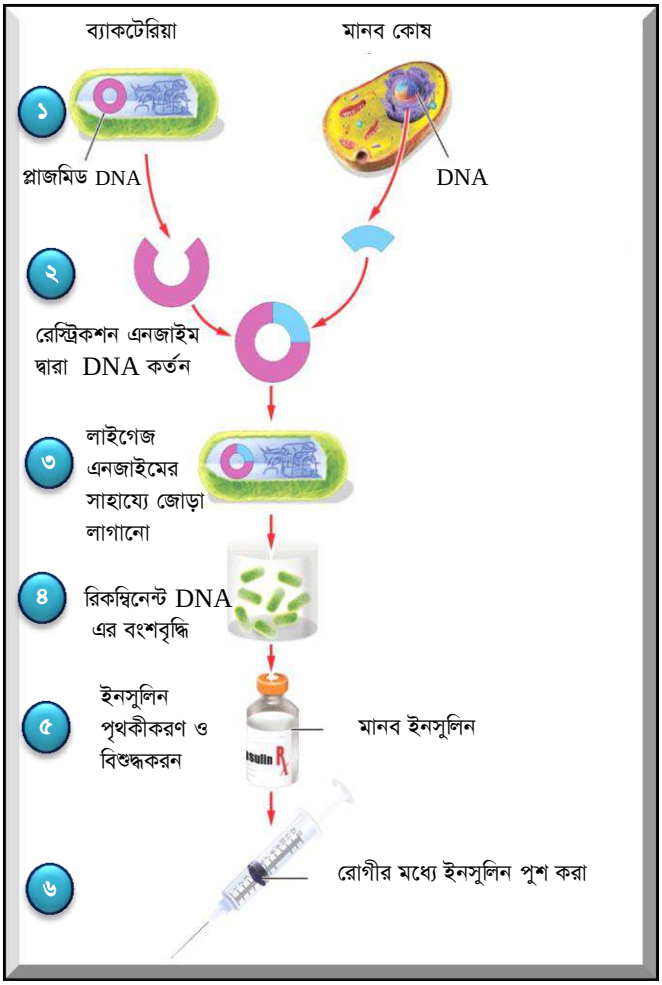

চিত্র : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন তৈরি প্রক্রিয়া

পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার (Use of Biotechnology in Environmental Management) : জ্ঞানবিজ্ঞানের বদৌলতে সভ্যতার উন্নতি ও আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির সাথে বর্ধিত পরিবেশ দূষণ ইদানিং মারাত্মক সমস্যর সৃষ্টি করেছে। তবে অতীতে দূষণের পরিমাণ এত ব্যাপক ছিল না এবং প্রকৃতি সাধারণত তার পচনশীল দূষিত পদার্থগুলোকে বিভিন্ন চক্রের সাহায্যে কম ক্ষতিকর অবস্থায় রূপান্তরিত করে সেগুলোকে জীব-ভূরাসায়নিক চক্রের সাহায্যের কাজে ব্যবহার করত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষের তৈরি বিষাক্ত দূষিত পদার্থ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশতন্ত্রের সমন্বয়কে (integrity) হুমকির সম্মুখীন করেছে।

যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নত করা যায়, পরিবেশ দূষণকারী উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায় তাকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলে। জীবজগতের বসবাসের জন্য চাই সুন্দর পরিবেশ। সুন্দর পরিবেশ ঠিক রাখা ও তৈরি করার জন্য চাই সুন্দর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য সৃষ্টি হচ্ছে নানা প্রযুক্তি। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

১। কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য (Waste from factories and mines) : শিল্প কারখানা ও খনি থেকে যেসব বর্জ্য নির্গত হয় তাতে পচনশীল জৈব-যৌগ, ভারী ধাতু, সায়ানাইড, ক্লোরিনযৌগ, ফসফেট, নাইট্রেট, অপচনযোগ্য রাসায়নিক পদার্থসহ পরিবেশ দূষণকারী বিভিন্ন পদার্থ যুক্ত থাকে। পচনশীল বস্তু দুগন্ধ সৃষ্টি করে। ভারী ধাতু ও রাসায়নিক বর্জ্য জলাধারের পানিতে মিশে জলজ প্রাণির বসবাসের অযোগ্য করে তোলে এবং মাটি দূষিত করে। গ্যাসীয় বর্জ্য বায়ু দূষণ ও এসিড বৃষ্টি ঘটায়।

জীবপ্রযুক্তিতে এসব দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ অণুজীবের সাহায্যে দূষণমুক্ত পদার্থে পরিণত করা হয়। কাগজ কলের বর্জ্য শোধনের জন্য কতিপয় ব্যাকটেরিয় ও ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। বর্জ্য পদার্থ শোধন ট্যাঙ্কে জমা করে সেখানে বিভিন্ন অণুজীবের উপস্থিতিতে ভারী ধাতু পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। অপচনশীল যৌগ হিসেবে চিহ্নিত বস্তুসমূহ, যেমন- DDT, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি ভাঙ্গনের জন্য বেশ কিছু অণুজীব বাছাই করা গেছে। এছাড়া জৈব বর্জ্য ব্যবহার করে অণুজীবের সাহায্যে সিঙ্গেল সেল প্রোটিন (CSP) উৎপাদন করা হচ্ছে। যা মানুষ ও পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জৈব এসিড , যেমন- ইথানল, ভিটামিন, গ্লিসারিন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

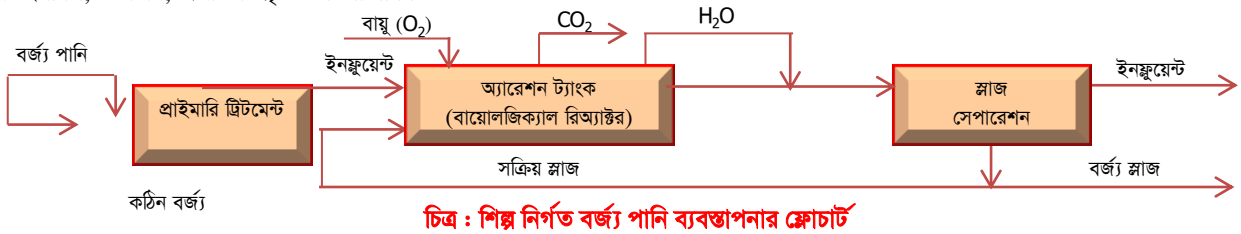

চিত্র : শিল্প নির্গত বর্জ্য পানি ব্যবস্তাপনার ফ্লোচার্ট

২। পানিতে তেল নির্গমন (Oil discharge in water) : বর্তমানে খনিজ তেল প্রধান জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অসংখ্য যানবাহন ও কলকারখানা সচল রাখতে তেলজাতীয় নানাবিধ উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্যাংকার জাহাজ। এসব কর্মকান্ডের ফলে প্রতিনিয়ত তেল বা তেলজাতীয় উপকরণ পানিতে পড়ে পানি দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তৈলাক্ত উপাদানকে সরল উপাদানে পরিণত করতে কিছু ব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Pseudomonas, Nocardia, Myobacterium* প্রভৃতি) সক্রিয় থাকে, কিন্তু এদের বিক্রিয়ার গতি মন্থর। তেলজাতীয় উপকরণগুলো জীর্ণ করতে যে এনজাইম দরকার হয় তার জিন ব্যাকটেরিয়ার মূল ক্রোমোজোমে না থেকে প্লাজমিডে অবস্থান করে। জিনগুলোকে বিভিন্ন উপকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি ব্যাকটেরিয়ায় সংযোজনের চেষ্টা চলছে। *Pseudomonas aeruginosa*–র এরূপ রুপান্তরিত একটি প্রকরণ তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ক্রমপর্যায়ের বিক্রিয়া ঘটানো যাবে এবং বিক্রিয়ার গতিও প্রাকৃতিক প্রকরণের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি হবে। ফলে বড় বড় দূষণঘটিত স্থানে এসব ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

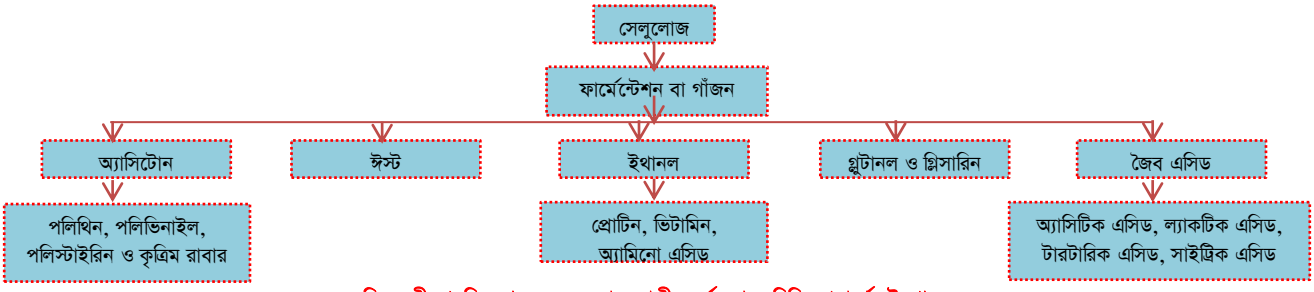

চিত্র : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্য থেকে বিভিন্ন পদার্থের উৎপাদন

৩। সিউয়েজ বা পয়ঃবর্জ্য আত্তীকরণ (Sewage assimilation) : সিউয়েজ হচ্ছে পয়ঃনিস্কাশিত তরল ময়লা যা জৈব ও অজৈব পদার্থের মিশ্রণ। এসব পদার্থের মধ্যে আবাসিক এলাকার গৃহ থেকে যেসব ময়লা পানি বের হয় তার মধ্যে শৌচাগারের সাবান পানি, রন্ধনশালার খাদ্যের অবশিষ্টাংশ, ময়লা পানি এবং পয়ঃপ্রণালি হতে মলমূত্র ইত্যাদি সিউয়েজ পদার্থ। সিউয়েজ পদার্থ যথাযথ ব্যবহার করা না হলে একদিকে যেমন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে পরিবেশ দূষিত করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রাথমিকভাবে জৈব প্রযুক্তি দ্বারা সিউয়েজের পদার্থগুলোর রুপান্তর করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রূপান্তরিত পদার্থগুলো প্লান্টের মাধ্যমে অত্যাধিক তাপমাত্রার জলীয় বাস্প দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং পরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মুল্যবান সার ও বিশুদ্ধ পানিতে পরিণত করা হয়। এ ধরনের সিউয়েজ আত্তীকরণের প্রথম পর্যায়টি যান্ত্রিক, দ্বিতীয়টি জৈব প্রযুক্তি এবং তৃতীয়টি রাসায়নিক পরিশোধন। জৈব প্রযুক্তি দ্বারা জৈব যৌগের পচনে *Nitrosomonas, Nitrobacter, Clostridium,* Protozoa প্রভৃতি অণুজীবকে ব্যবহার করা হয়।

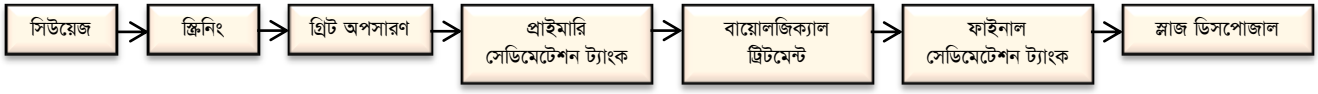

চিত্র : সিউযেজ ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জীবপ্রযুক্তির সাফল্য (The Success of Biotechnology in the Context of Bangladesh) :

- ১৯৭০ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে পাটের টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক জীবপ্রযুক্তির সূচনা ঘটে। পরবর্তী ১০-১২ বছরের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারিভাবে বেশ কয়েকটি টিস্যু কালচার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- বর্তমানে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট কোম্পানি জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প পন্য উৎপাদন করছে।
- মলিকিউলার মার্কার ব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীগণ লবণ সহিষ্ণু ধান, ঠান্ডা সহিষ্ণু পাট এবং পতঙ্গ প্রতিরোধী ডালের জাত উদ্ভাবন করেছেন।
- জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ICDDR,B সিগেলা ভ্যাক্সিন (shigella vaccine) উৎপাদন করছে।
- বারডেম হাসপাতাল পিসিআর (PCR) পদ্ধতি দ্বারা যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস, এইডস এর মতো জটিল রোগের মলিকিউলার ডায়াগনোসিস ও ক্যারিওটাইপিং সেবা প্রদান করছে।
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI) ছাগলের প্লেগ, বসন্ত রোগ সহ হাঁস-মুরগির বেশ কয়েকটি ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিনে প্রাণিসম্পদ সেবা বিভাগ (DLS) গরুর ফুট এন্ড মাউথ ডিজিসস ও অ্যানথ্রাক্স, মুরগির কলেরা ও সালমোনেলা নিউক্যাসল ডিজিসস-এর ভ্যাকসিন উৎপাদন করছে।
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) বিপন্ন প্রজাতির মাছের রেণু উৎপাদন, নির্বাচিত প্রজনন পদ্ধতিতে কার্প, ক্যাটফিস, GIFT (genetically improved farmed tilapia) তেলাপিয়ার উৎপাদন, মনোসেক্স তেলাপিয়ার উৎপাদন, মাগুর ও পুটি মাছের হাইব্রিড জাত উৎপাদন এবং মিঠা পানির ঝিনুক থেকে মুক্তা উৎপাদনের লক্ষে বেশ কিছু মৌলিক জীবপ্রযুক্তির গবেষণা কাজ করছে।
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) আধুনিক আণবিক প্রযুক্তি (যেমন- DAS-ELISA, রিয়াল টাইম PCR, হাইব্রিডাইজেশন ইত্যাদি) ব্যবহার করে ফসলি, ফলজ, বনজ, ওষুধি ও সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের প্যাথোজেন (ভাইরাস ও ব্যকটেরিয়া) শনাক্তকরণের প্রোটোকল উদ্ভাবন করেছে।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC) তাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিম্ন মাত্রার গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধি, স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT) দ্বারা ফলের মাছি ও Aedes মশা নিয়ন্ত্রণ, হরমোন ও ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে সমন্বিত বালাই দমন (IPM) ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।
- দেশীয় ছাগল, ভেড়া, গরু ও মহিষের বংশপরিচয় যাচাই (parentage verification) ও আনবিক বৈশিষ্ট্যায়নের (molecular characterization) জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (NIB) এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI) DNA ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও মাইক্রোস্যাটেলাইট জিনোটাইপিং পদ্ধতির উপর গবেষণা করছে।

ড. মাকসুদুল আলম

ড. মারমা

ড. হাসিনা খান

ড. নিয়ামুল নাসের

ড. সিরাজুল ইসলাম

ড. মনজুর হোসেন

চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকজন জীবপ্রযুক্তিবিদ

- ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞানী ২০১০ সালে পাটের জিনোমিক সিকুয়েন্স আবিষ্কার করেছেন। ২০০৮ সালে এ প্রকল্প শুরু হয়ে ২০১০ সালে শেষ হয়। পাটের জিনোম আবিস্কারের জন্য তোষা জাতের (*Corchorus olitorius*) পাটের Genomic DNA (gDNA) ব্যবহার করা হয়। জিনোমিক সিকুয়েন্স আবিষ্কার পাটের গুণগত মান উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এর ফলে পাটের লবণাক্ততা সহনশীল ও পতঙ্গরোধী জাত উদ্ভাবন সহজ হবে বলে বিজ্ঞানীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এতে সোনালী আঁশ সোনালী দিন ফিরে পাবে।
- আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মং সানো মারমা-র নেতুত্বে বাংলাদেশের আরো একদল বিজ্ঞানী ২০১৮ সালে ইলিশ মাছের (*Temualosa ilisha*) জিনোমিক সিকুয়েন্স আবিষ্কার করেছেন। এ আবিস্কারে ড. মারমা-র সহযোগি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিক্যুলার বিভাগ এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের একদল গবেষক।

জিনোম (Genome) : জীবের সকল জেনেটিক বা বংশগতির তথ্য ভান্ডারকে জিনোম বলে। অধিকাংশ জীবে এগুলো DNA সাংকেতিক রূপে ক্রোমোজোমে অবস্থান করে। তবে অনেকক্ষেত্রে RNA সাংকেতিকরুপেও (যেমন- ভাইরাসের ক্ষেত্রে) থাকে। কোনো কোনো জীবে এরা প্রাজমিডে (যেমন- ব্যাকটেরিয়া) অথবা মাইটোকন্ড্রিয়া বা ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে। ক্রোমোজোমের মুখ্য উপদান DNA এবং DNA-এর অংশবিশেষই জিন হিসেবে কাজ করে।

জিনোমই জীবের জেনেটিক বা বংশগতীয় সকল বৈশিষ্ট্যের নীলনকশা (blue print) ধারন করে, এজন্য জিনোমকে মাস্টার ব্লু-প্রিন্ট (master blue print) বলা হয়। হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে একটি জিনোম এবং ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াসে দুটি জিনোম থাকে। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ২৩টি ক্রোমোজোম রয়েছে। মানব জিনোম হলো কোষের নিউক্রিয়াসে বিদ্যমান ২৩টি ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত সমস্ত জিনের একটি সেট। সুতরাং সহজভাবে বলা যায়, কোনো জীবের সকল ধরনের একসেট ক্রোমোজোমে বিদ্যমান সকল বংশগতির তথ্য বা জিন বা DNA এর সমাহারকে জিনোম বলে। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী হ্যানস উইনকার (Hans Winkler) ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম জিনোম শব্দটি ব্যবহার করেন।

জিনোম সিকুয়েন্সিং (Genome sequencing) : প্রতিটি জীবের ক্রোমোজোমে বিদ্যমান সকল DNA বা জিন অসংখ্য ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড দিয়ে গঠিত। প্রতিটি ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইডে থাকে এক অণু ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগার (পেন্টোজ স্যুগার), এক অণু নাইট্রোজেন বেস (A, G, C, T এর যে কোনো একটি) এবং এক অণু অজৈব ফসফেট। A, G, C, ও T-কে Chemical alphabet of life বলা হয। DNA-তে চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক নির্দিষ্ট অনুক্রমে সজ্জিত থাকে। কোনো জীবের জিনোমে নাইট্রোজেন ক্ষারকগুলো কীভাবে সজ্জিত থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তা নির্ণয় করার পদ্ধতিকে জিনোম সিকুয়েন্সিং (genome sequencing) বলে। এটি রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সঠিকভাবে DNA অণুর বেস বা ক্ষার অনুক্রম জানা যায়। বিট্রিশ রসায়নবিদ ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার (Frederick Sanger) ১৯৭৭ সালে এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এজন্য তাঁকে ১৯৮০ সালে দ্বিতীয়বার রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জিনোম সিকুয়েন্সিং এর প্রয়োগ (Application of genome sequencing) : কোনো জীবের জীবন রহস্য জানার প্রাথমিক ধাপ হলো জিনোম সিকুয়েন্সিং। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি নতুন নতুন গবেষণার সম্ভব্য দ্বার উম্মোচিত করেছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টসহ প্রতিনিয়ত জীববিজ্ঞানের বহু অজানা রহস্যকে জেনে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। নিচে জিনোম সিকুয়েন্সিং এর বিভিন্ন প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ সম্ভবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

- **কৃষিবিজ্ঞানে (In Agriculture) :** জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অণুজীবের জিনোম সিকুয়েন্সিং দ্বারা সুনির্দিষ্ট সংখ্যেক জিন প্রয়োগ করে রোগবালাই ও পীড়ন প্রতিরোধী ফসলী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবাদি পশু থেকে অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অধিক সালোকসংশ্লেষণকারী ও অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। জীবাণু সার তৈরি করে ফসলী উদ্ভিদে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম ও তাঁর সহযোগীরা তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকুয়েন্সিং তথা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন। পাটের বেস পেয়ার ১২০ কোটি। এগুলো কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারনা, জিনোম সিকুয়েন্সিং জানার ফলে বর্তমানে উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে মিহি আঁশের পাট, সহজে পচনযোগ্য পাট, পোকা প্রতিরোধক পাট, ওষুধি পাট, তুলার মতো শক্ত আঁশের পাট ইত্যাদি। যা পাট শিল্পে অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে ড. মাকসুদুল আলম মৃত্যুবরণ করেছেন।

ড. মাকসুদুল আলম

- **চিকিৎসা বিজ্ঞানে (In medical science) :** জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রয়োগ করে বর্তমানে বংশগত রোগ নির্ণয় করে জিন থেরাপির মাধ্যমে এসব রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে। অণুজীবের জিনোম সিকুয়েন্সিং কাজে লাগিয়ে জৈবিক ওষুধ উৎপাদন করে বর্তমানে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পন্ন রাসায়নিক ওষুধের পরিবর্তে ব্যবহার করছেন। বিজ্ঞানীরা ধারনা করছেন, এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সমস্য সম্পর্কে পূর্বেই জানা যাবে এবং বিভিন্ন রোগের অগ্রিম চিকিৎসা নেওয়া যাবে।
- **ফরেনসিক বিজ্ঞানে (In forensic science) :** প্রতিটি মানুষের একটি নিজস্ব DNA সিকুয়েন্স থাকে। এজন্য বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ফরেনসিক বিজ্ঞানে DNA সিকুয়েন্সিং প্রয়োগ করা হয়। অপরাধী ও সন্তানের পিতা-মাতা শনাক্তকরণে DNA সিকুয়েন্সিং করা হয়। এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় ও সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণি শনাক্তকরণে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- **সমুদ্র বিজ্ঞানে (In oceanography) :** পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ পানি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে এক চামচ সমুদ্রের পানিতে প্রায় $১০^{৯}$ ভাইরাস থাকে যা সমুদ্রকে সবচেয়ে বিস্তৃত জীব বৈচিত্র্যের আধার হিসেবে পরিগণিত করেছে। এদের জিনোম সিকুয়েন্সিং মানব কল্যানের বিভিন্ন সম্ভবনার নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে।
- **হিউম্যান জিনোম প্রজক্ট (Human Genome Project) :** জিনোম সিকুয়েন্সিং প্রযুক্তি দ্বারা মানুষের ২৩টি ক্রোমোজোমে বিদ্যমান ২০০০০ – ২৫০০০ সক্রিয় জিনের ৩ বিলিয়ন নিউক্লিওটাইড অণুর গাঠনিক বিন্যাস ও কাজের ধারা নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। এতে সময় লেগেছে প্রায় ১৩ বছর (১৯৯০-২০০৩)।

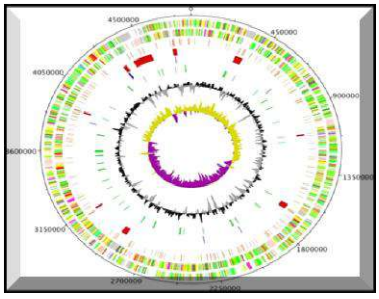
চিত্র : একটি ব্যাকটেরিয়ার জিনোম সিকুয়েন্সিং

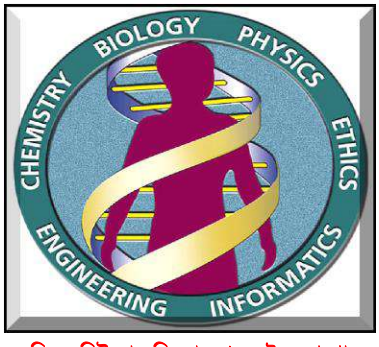

চিত্র : হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের লোগো

জীবপ্রযুক্তিগত খাদ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকি (GMO Health Risk) : আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় জীবপ্রযুক্তিগত খাদ্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্টের প্রায় ৮০% প্রক্রিয়াজাত খাদ্যই জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে সৃষ্ট। এসব খাদ্যে কোনো লেবেলিং না থাকায় ভোক্তাগণ জানে না যে তারা কি খাচ্ছে, ফলে বিপদ অবধারিত।

- **জিএম সয়া এবং অ্যালার্জিক ক্রিয়া (GM soya and allergic reactions) :** যুক্তরাষ্টের জিন প্রকৌশলগত সয়াবিন (জিএম সয়া) প্রবেশের পর প্রায় ৫০% মানুষের অ্যালার্জি দেখা দিয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কিছু মানুষের জিএম সয়া খেলে ত্বকীয় অ্যালার্জি দেখা দেয় কিন্তু বন্য প্রাকৃতিক সয়া খেলে অ্যালার্জি দেখা দেয় না।
- **বিটি কর্ন এবং অ্যালার্জিক ক্রিয়া (Bt corn linked to allergies) :** বিটি জিন সমৃদ্ধ কর্ন খাদ্য মানবদেহে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে বলে প্রমাণিত। সাধারণত বিটি জিন সমৃদ্ধ ফসল স্বাভাবিক ফসল হতে অধিক বিষাক্ত।
- **জিএম খাদ্য ও যকৃত সমস্য (GMOs and liver problems) :** গবেষণায় দেখা গেছে জিএম আলু খাওয়ানো ইদুরের যকৃত আকারে ছোট ও অপুষ্ট ধরনের হয়। অন্যদিকে জিএম ক্যানোলা খাওয়ানো ইদুরের যকৃত স্বাভাবিকের চেয়ে ১২-১৬% বড় হয়।
- **জিএম খাদ্য এবং প্রজনন সমস্য (GMOs and reproductive problems) :** পরীক্ষাগারে যে সব মা ইদুরকে জিএম খাদ্য খাওয়ানো হয় তাদের অর্ধেক বাচ্চা তিন সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। জিএম সয়া খাওয়ানো পুরুষ ইদুরের শুক্রাশয়ে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।
- **বিটি ফসল-বন্ধ্যত্ব রোগ ও মৃত্যু (Bt crops-sterility disease and death) :** ভারতে বিটি তুলা উদ্ভিদের পাতা খেয়ে কয়েক হাজার ভেড়া, মহিষ ও ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। এদের অনেকগুলো দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারি কিংবা নানান রোগে আক্রান্ত হয়েছে।
- **মানবদেহে কার্যকরী জিএম জিন (Functioning GM genes remain inside us) :** জিএম সয়া থেকে জিএম জিন মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়ার জিনোমে প্রবেশ করে। ফলে জিএম খাদ্য খাওয়া বন্ধ করলেও আমাদের দেহে জিএম জিন দ্বারা সর্বদা প্রোটিন তৈরি হতে থাকে।

যদি জিএম খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক জিন থাকে তাহলে এরা দেহে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ সুপার ডিজিস তৈরি করে।

জিএম খাদ্যে বিটি জিন থাকলে অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াগুলো জীবিত পেস্টিসাইডের ফ্যাক্টরিতে পরিনত হয়।

ঝুঁকি নির্ধারণ পদ্ধতি (Risk assessment method) : ঝুঁকি নির্ধারণের সময় নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষের বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষ ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্য নিতে হবে। ঝুঁকি নির্ধারণের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

- পরীক্ষাধীন GMO/LMO-র এমন কোনো বাহ্যিক বা জিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত হয় যা জীব বৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অতিদ্রুত তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে।
- সম্ভব্য ঝুকিসমুহ শনাক্ত হলে ঝুকির ধরন ও মাত্রা কতটুকু তা নির্ধারণ করতে হবে।
- মূল্যায়ন পরীক্ষা করে পরীক্ষাধীন GMO/LMO-এর সার্বিক ঝুকি ও সম্ভাব্য পরিণতি অনুধাবন করা যাবে।
- সবশেষে ঝুকির মাত্রা বিবেচনা করে এটি নির্ভরযোগ্য কি না তা বিবেচনা করে সুপারিশ করতে হবে।

গবেষণাগারে GMOs/LMOs নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধানসমূহ (Safety provisions for research on GMOs / LMOs in the laboratory) :

- গবেষণাগারে জীবপ্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার মূলনীতি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যে গবেষণাগারে গবেষণা কাজ সম্পাদান করা হবে তার কর্মপরিকল্পনা, যাচাই, নিবন্ধন ও রিপোর্ট নিশ্চিত করতে হবে।
- গবেষণাগারের সুযোগ সুবিধা, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও যোগ্য গবেষক নিশ্চিত করতে হবে।
- গবেষণায় সম্পৃক্ত প্রত্যেক পেশাগত ও কারিগরি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- গবেষণাগারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরাপত্তা বিধানসমুহ অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্ভাব্য ঝুঁকির অনুসন্ধান করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে GMOs/LMOs সমুহ ব্যবহার বা অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধানসমুহ (Safety provisions for the use or release of GMOs / LMOs at the field level) :

- মাঠপর্যায়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর এর সম্ভাব্য ঝুকির প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিসমুহ প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিবেশে এদের প্রবর্তন করা হবে তার উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, সর্বোপরি মানব স্বাস্থ্যের উপর এদের প্রভাব নির্ণয় করতে হবে।
- অণুজীবসহ পরিবেশের অনিশ্চিত প্রভাবকসমুহের GMOs/LMOs-র জেনেটিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে।
- কোন GMOs/LMOs-এর যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ বা মানবস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ প্রমাণিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোকে মাঠ পর্যায়ে অবমুক্ত করা যাবে না।

টিস্যু কালচার ও সংকরায়ণ (হাইব্রিডাইজেশন)-এর মধ্যে পার্থক্য
(Differences between tissue culture and hybridization) :

পার্থক্যের বিষয়	টিস্যু কালচার (Tissue culture)	সংকরায়ণ (Hybridization)
১। জনন পদ্ধতি	এটি এক প্রকার কৃত্রিম অঙ্গজ জনন পদ্ধতি।	এটি এক প্রকার কৃত্রিম যৌন জনন পদ্ধতি।
২। বংশধর সৃষ্টি	একটি প্যারেন্টের যে কোনো একটি বিভাজনক্ষম টিস্যু কৃত্রিম আবাদ মাদ্যমে আবাদ করে নতুন বংশধর সৃষ্টি করা হয়।	দুটি প্যারেন্টের মধ্যে কৃত্রিমভাবে যৌন মিলন ঘটিয়ে নতুন বংশধর সৃষ্টি করা হয়।
৩। গুণাগুণ	প্যারেন্ট ও অপাত্য উদ্ভিদ সমগুণ সম্পন্ন হয়।	প্যারেন্ট ও অপাত্য উদ্ভিদ ভিন্নগুণ সম্পন্ন হয়।
৪। উদ্ভিদ প্রকৃতি	অপাত্য উদ্ভিদ সাধারণত অনুন্নত ও দুর্বল প্রকৃতির হয়।	অপাত্য উদ্ভিদ সাধারণত উন্নত ও সবল প্রকৃতির হয়।
৫। উদ্ভিদ সংখ্যা	অল্প সময়ে বেশি সংখ্যেক বংশধর সৃষ্টি হয়।	তুলনামূলক বেশি সময়ে অল্প সংখ্যেক বংশধর সৃষ্টি হয়।
৬। কাঙ্খিত সময়	কাঙ্খিত ফল লাভে কম সময় লাগে।	কাঙ্খিত ফল লাভে দীর্ঘ সময় লাগে।
৭। নতুন গুণ	অপাত্য জীবে সাধারণত নতুন গুণের বিকাশ ঘটে না।	অপাত্য জীবে নতুন গুণের বিকাশ ঘটে।
৮। জিন বিনিময়	সাধারণত জিন বিনিময় ঘটে না।	জিন বিনিময় অবশ্যম্ভাবী।

টিস্যু কালচার ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য
(Differences between tissue culture and recombinant DNA technology) :

পার্থক্যের বিষয়	টিস্যু কালচার	রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি
১। সংজ্ঞা	জীবদেহের বিচ্ছিন্নকৃত কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যু কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে আবাদ করে চারা উদ্ভিদ সৃষ্টি বা টিস্যু বৃদ্ধির (প্রাণির ক্ষেত্রে) প্রক্রিয়াকে টিস্যু কালচার বলে।	কোনো জীবের DNA-তে ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীতএক বা একাধিক কাঙ্খিত জিন বা DNA খন্ড সংযুক্ত করে সংকর DNA তৈরির কৌশলকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে।
২। উদ্ভিদের ধরন	উৎপন্ন জীব মাতৃ উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন হয়।	উৎপন্ন জীব মাতৃ উদ্ভিদের ভিন্নগুণ সম্পন্ন হয়।
৩। জিন ম্যানিপুলেশন	এক্ষেত্রে জিন ম্যানিপুলেশন করে জীবের জিনোটাইপের পরিবর্তন করা হয় না।	এক্ষেত্রে জিন ম্যানিপুলেশন করে জীবের জিনোটাইপের পরিবর্তন করা হয়।
৪। ব্যবহার	ভাইরাস ও রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়।	কাঙ্খিতবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।
৫। বাহক	এক্ষেত্রে বাহক বা ভেক্টরের প্রয়োজন হয় না।	এক্ষেত্রে বাহক বা ভেক্টরের প্রয়োজন হয়।
৬। প্রক্রিয়া	অপেক্ষাকৃত কম জটিল প্রক্রিয়া।	অপেক্ষাকৃত বেশি জটিল প্রক্রিয়া।
৭। স্বাস্থ্য ঝুকি	স্বাস্থ্য ঝুকি সৃষ্টির সম্ভবনা নেই।	স্বাস্থ্য ঝুকি সৃষ্টির সম্ভবনা বর্তমান।

ট্রান্সজেনিক প্রাণি ও ক্লোন প্রাণির মধ্যে পার্থক্য
(Differences between transgenic animals and cloned animals) :

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সজেনিক প্রাণি (Transgenic Animals)	ক্লোন প্রাণি (Cloned Animal)
১। জিনগত পার্থক্য	বাহির থেকে জিন প্রবেশ করানোতে জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	দুটি প্রাণির নিউক্লিয়ার জিন একত্রিত হয় না বিধায় জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।
২। বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ	বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে।	কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে না।
৩। জিনোমগত পার্থক্য	জিনোমগত পার্থক্য সৃষ্টি হয।	জিনোমগত গঠন একই রকম হয়।
৪। মিউটেশন	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে।	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে না।
৫। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে ভিন্নতা দেখা দেয়।	বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হুবহু একইরকম।

❖ **জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) :** সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে মানব কল্যাণকর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করার পদ্ধতিকে বায়োটেকনোলজি বা জীবপ্রযুক্তি বলে।

❖ **টিস্যু কালচার (Tissue culture) :** যে পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বিভাজনক্ষম কোনো সজীব অঙ্গের টিস্যুকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত পুষ্টি মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করে নতুন চারা উৎপাদন করা হয়, তাকে টিস্যু কালচার বলা হয়।

❖ **মাইক্রোপ্রোপাগেশন (Micropropagation) :** যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বা অঙ্গাংশ যেমন- পরাগরেণু, ভ্রূণ, ডিম্বাণু প্রভৃতির ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা হয় তাকে মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলে।

❖ **এক্সপ্লান্ট (Explant) :** উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করে টিস্যু কালচারে ব্যবহার করা হয় তাকে এক্সপ্লান্ট বলা হয়।

❖ **অ্যাগার (Agar) :** অ্যাগার হচ্ছে শৈবাল থেকে প্রাপ্ত একটি স্বচ্ছ, নাইট্রোজেনমুক্ত, জিলেটিন জাতীয় পদার্থ।

❖ **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic engineering) :** নতুন ও কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো একটি জীবের DNA অণুকে অন্য কোনো একটি জীবের DNA-তে সংস্থাপন করে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে।

❖ **জিএমও (GMO) :** জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের DNA স্থানান্তর করে পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যের যে জীব উৎপন্ন করা হয় তাকে GMO (Genetically Modified Organism) বলে এবং জীবটি যদি অণুজীব হয় তখন তাকে GMM বলে।

❖ **ট্রান্সজেনেসিস (Transgenesis) :** যে পদ্ধতিতে কোনো জীবের জিনোমে বহিরাগত জিন প্রবেশ করিয়ে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা হয়, তাকে ট্রান্সজেনেসিস বলে। এ পদ্ধতিতে উৎপন্ন জীবকে ট্রন্সজেনিক জীব বলে।

❖ **ইলেকট্রোফোরেসিস (Electrophoresis) :** বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োগে আধানযুক্ত অণুর পৃথকীকরণ পদ্ধতিকে ইলেকট্রোফোরেসিস বলে।

❖ **ট্রান্সফরমেশন (Transformation) :** বাহ্যিক পরিবেশ থেকে ব্যাকটেরিয়া কোষে (ইলেকট্রোপোরেশন বা লাইপোজোম এর মাধ্যমে) রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশের প্রক্রিয়াকে ট্রান্সফরমেশন বলে।

❖ **রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction enzymes) :** যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সের একটি অংশ কেটে নেওয়া যায় ঐ এনজাইমকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে।

❖ **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি (Recombinant DNA technology) :** যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্খিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে।

❖ **জিন থেরাপি (Gene therapy) :** জিনের ত্রুটিজনিত কারণে রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে ত্রুটিমুক্ত জিন প্রবেশ করিয়ে রোগ নিরাময়কে বলে জিন থেরাপি। এর ফলে ত্রুটিপূর্ণ জিনকে দেহ থেকে অপসারণ করা হয়।

❖ **DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট (DNA fingerprint) :** কোনো জীবের DNA-কে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কেটে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস এর মাধ্যমে উক্ত DNA-এর যে ফটোগ্রাফি বিন্যাস বা ছাপ পাওয়া যায় তাকে DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট বা DNA Profile বলে।

❖ **হিউমুলিন (Humulin) :** জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত মানব ইনসুলিনকে হিউমুলিন বলে।

❖ **জিন মার্কার (Gene marker) :** জীবের কোনো কোষ রিকম্বিনেন্ট DNA গ্রহণ করে পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তা শনাক্তকরণের জন্য যে জিন ব্যবহার করা হয় তাকে জিন মার্কার বলে।

❖ **জিন ক্লোনিং (Gene cloning) :** যে পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট জিন থেকে অনেকগুলো প্রতিরুপ সৃষ্টি হয় তাকে জিন ক্লোনিং বলে।

❖ **জিনোম (Genome) :** কোনো জীবের সকল ধরনের এক সেট ক্রোমোজোমে বিদ্যমান সকল বংশগতির তথ্য বা জিন বা DNA-এর সমাহারকে জিনোম বলে।

❖ **জিনোম সিকোয়েন্স (Genome sequence) :** কোনো জীবের DNA-তে নাইট্রোজেন বেসগুলো যে নির্দিষ্ট অনুক্রমে সজ্জিত থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাকে জিনোম সিকোয়েন্স বলে।

❖ **জিনোম সিকোয়েন্সিং (Genome sequencing) :** কোনো জীবের জিনোমের DNA অণুর ক্ষারসমূহ (AGCT) কোন অণুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানার প্রক্রিয়াকে জিনোম সিকোয়েন্সিং বলে।

❖ **ইনসুলিন (Insulin) :** ইনসুলিন হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণির অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স গ্রন্থির বিটা কোষগুচ্ছ হতে ক্ষরিত হয়।

❖ **প্লাজমিড (Plasmid) :** ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোজোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার বা রিং আকৃতির দ্বি-সূত্রক DNA থাকে তাকে প্লাজমিড বলে।

❖ **প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন (Protoplast fusion) :** এ পদ্ধতিতে দুটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত দুটি প্রজাতির গাছের কোষকে একত্রে করা হয়।

❖ **রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং (Reproductive cloning) :** দাতা কোষের DNA-এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং বলে। ১৯৯৬ সালে ডলি নামক ভেড়ি এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছিল।

❖ **ভ্যাকসিন (Vaccine) :** রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের শরীরে প্রয়োগ করলে ঐ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জন্মায় তাকে ভ্যাকসিন বলা হয়।

❖ **বায়োরিঅ্যাক্টর (Bioreactor) :** বায়োরিঅ্যাক্টর হচ্ছে এক ধরনের প্রযুক্তিগত যন্ত্র বা সিস্টেম, যা কোনো জৈবিক প্রক্রিয়া সংঘটনের জন্য সক্রিয় পরিবেশ বজায় রাখে। ট্রান্সজেনিক জীবগুলো বায়োরিঅ্যাক্টরের মতো কাজ করে।

❖ **পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন (PCR) :** এটি জিন ক্লোনিং-এর একটি সহজ যান্ত্রিক উপায়। এর মাধ্যমে সহজেই DNA সংশ্লেষ করা যায়। PCR (Polymerase Chain Reaction) এর মাধ্যমে একটি টেস্টটিউবে একটি জিনের বহু কপি তৈরি করা যায়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (Knowledge Based Questions)

১। বায়োটেকনোলজি কী?
২। টিস্যু কালচার কী?
৩। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?
৪। গোল্ডেন রাইস কী?
৫। বিটি বেগুন কী?
৬। ট্রান্সজেনিক জীব কী?
৭। হিউমুলিন কী?
৮। জিনোম সিকুয়েন্সিং কী?
৯। প্লাজমিড কী?
১০। আণবিক কাঁচি কী?
১১। GM ফসল কী?
১২। ইন্টারফেরন কী?
১৩। মেরিস্টেম কী?
১৪। এক্সপ্লান্ট কী?
১৫। রিকম্বিনেন্ট DNA কী?
১৬। রেস্ট্রিকশন এনজাইম কী?
১৭। জিন ক্লোনিং কী?
১৮। সাইব্রিড কী?
১৯। মাইক্রোপ্রোপাগেশন কী?
২০। এক্সপ্লান্ট কী?
২১। অ্যাগার কী?
২২। ক্যালাস কী?
২৩। প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন কী?
২৪। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন কী?
২৫। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি কী?
২৬। ট্রান্সফরমেশন কী?
২৭। সুপার রাইস কী?
২৮। বায়োরিঅ্যাক্টর কী?
২৯। জিন ক্লোনিং কী?
৩০। ক্লোন কী?
৩১। ইনসুলিন কী?
৩২। ইন্টারফেরন কী?
৩৩। জিন লাইব্রেরি কী?
৩৪। ইলেকট্রোপোরেশন কী?
৩৫। জিন মার্কার কী?
৩৬। জিন থেরাপি কী?
৩৭। ভ্যাকসিন কী?
৩৮। জিনোম কী?
৩৯। রেস্ট্রিকশন এনজাইম কী?
৪০। DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং কী?
৪১। কে জিনোম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন?
৪২। সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশন কী?
৪৩। জিন ম্যাপ কী
৪৪। রিকমবিনেন্ট ডিএনএ কী?
৪৫। ইনসুলিন কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন (Comprehension Based Questions)

১। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার লিখ?
২। কৃষি উৎপাদনে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার লিখ?
৩। পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় জীব প্রযুক্তির ব্যবহার লিখ?
৪। প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন বলতে কী বুঝ?
৫। জিন ক্লোনিং-এ প্লাজমিড ব্যবহৃত হয় কেন?
৬। কালচার মিডিয়াম বলতে কী বুঝ?
৭। হাইব্রিডাইজেশন বলতে কী বুঝ?
৮। জিনোম সিকোয়েন্সিং বলতে কী বুঝায়?
৯। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কী বুঝ?
১০। রিকম্বিনেন্ট DNA বলতে কী বুঝ?
১১। প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্য লিখ?
১২। জীবপ্রযুক্তিতে কেন প্লাজমিড ব্যবহৃত হয়?
১৩। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে কী রোগমুক্ত চারা তৈরি সম্ভব?
১৪। GM খাদ্য ফসল বলতে কী বোঝায়?
১৫। কীভাবে উদ্ভিদের হ্যাপ্লয়েড লাইন তৈরি করা হয়?
১৬। রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং বলতে কী বুঝ?
১৭। DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং বরতে কী বুঝ?
১৮। জীবনিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়?
১৯। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন বলতে কী বুঝ?
২০। ইন্টারপেরনের গুরুত্ব কী?
২১। ক্যালাস কী- ব্যাখ্যা কর?
২২। রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে আণবিক কাঁচি বলা হয় কেন?
২৩। প্লাজমিডকে ভেক্টর বলা হয় কেন?
২৪। অপরাধী শনাক্তকরণে জিনোম সিকোয়েন্সিং কেন ব্যবহৃত হয়?
২৫। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল উন্নত কেন?
২৬। GM–এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ?
২৭। প্রাণি থেকে উদ্ভিদে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল সহজ কেন
২৮। জিন থেরাপি বলতে কী বুঝ?
২৯। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৩০। বায়োইন্ডিকেটর বলতে কী বুঝ?
৩১। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন বলতে কী বুঝ?
৩২। অপরাধী শনাক্তে কীভাবে জিনোম সিকোয়েন্সিং ব্যবহৃত হয়?
৩৩। বেসাল মিডিয়ামে কী কী থাকে? ব্যাখ্যা কর।
৩৪। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৩৫। জিনোমকে জীবের মাস্টার ব্লু প্রিন্ট বলা হয়। ব্যাখ্যা কর?
৩৬। ডিএনএ খন্ডকে কে জোড়বদ্ধ করে?
৩৭। জিন ব্যাংক কিভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে?
৩৮। ক্যালাসে কী কী প্রয়োগের মাধ্যমে মূল ও বিটপ তৈরি হয়?
৩৯। কোন প্রক্রিয়ায় বায়োগ্যাস থেকে জ্বালানি উৎপন্ন হয়?
৪০। পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং আবিস্কারে সোনালী আঁশ সোনালী দিন ফিরে পাবে। ব্যাখ্যা কর?
৪১। Traditional Biotechnology বলতে কী বুঝায়?
৪২। মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলতে কী বুঝায়?
৪৩। সিঙ্গেল কপি প্লাজমিড বলতে কী বুঝায়?
৪৪। মাল্টিকপি প্লাজমিড বলতে কী বুঝায়?
৪৫। হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট বলতে কী বুঝ?

১। ড. সোহেল গবেষণাগারে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আলুর মুকুল থেকে অনেকগুলো চারা তৈরি করলেন। অন্যদিকে ড. মিজান β ক্যারোটিন এবং আয়রন উৎপন্নকারী জিনসমৃদ্ধ ভুট্টার জাত আবিস্কার করেন। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৯]*

(ক) এক্সপ্লান্ট কী? ১

(খ) GM শস্য বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত আলুর চারা তৈরি কিভাবে সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ড. মিজান এর প্রযুক্তিটির সম্ভাবনা ব্যাখ্যা কর। ৪

২। একটি বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে আদিকোষী অণুজীবের DNA থেকে একটি ভুট্টা উদ্ভিদের জিনোমে প্রবেশ করিয়ে ক্ষতিকারক কর্ণবোরার প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭]*

(ক) Bt বেগুন কী? ১

(খ) হাইব্রিডাইজেশন বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তির ধাপসমূহ চিত্রের সাহায্যে দেখাও। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিতে সৃষ্টি DNA-কে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ প্রবেশ করানোর পর দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটানোর প্রক্রিয়াটি কৃষিক্ষেত্রে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে- বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

P = উদ্ভিদের বিভাজনক্ষম অংশ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি।

Q = আদিকোষীয় বৃত্তাকার DNA ব্যবহার করে জীব সৃষ্টি।

(ক) বায়োটেকনোলজি কী? ১

(খ) টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার লিখ? ২

(গ) P- পদ্ধতিতে সৃষ্ট উদ্ভিদ কৃষিক্ষেত্রে কোন ধরণের ভুমিকা পালন করবে। ৩

(ঘ) Q- পদ্ধতিতে উদ্দীপকে উপাদান ব্যবহার করে কীভাবে নতুন জীব সৃষ্টি করা যাবে- ব্যাখ্যা কর। ৪

৪। ড. বুলবুল গবেষণাগারে বীজ ছাড়াই A উদ্ভিদের অসংখ্য চারা তৈরি করেন এবং ড. এমদাদ B উদ্ভিদে বিটা ক্যারোটিন ও আয়রন তৈরির জিন সংযুক্ত করে নতুন জাত তৈরি করেন।

(ক) ট্রান্সজেনিক জী কী? ১

(খ) কালচার মিডিয়াম বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে A উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ভূমিকা লিখ। ৩

(ঘ) A উদ্ভিদ ও B উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তির মধ্যে তুলনা কর। ৪

৫। বাংলাদেশী বিজ্ঞানীরা একটি বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে GM সবজি ফসল Bt বেগুন উদ্ভাবন করেছেন। ইহা একদিকে উচ্চ ফলনশীল অন্যদিকে রোগ-বালাই প্রতিরোধী। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]*

(ক) ইন্টারফেরন কী? ১

(খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকে নির্দেশিত বিশেষ প্রযুক্তির ধাপসমুহ চিত্রের সাহায্যে দেখাও। ৩

(ঘ) স্বাস্থ্য রক্ষায় উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রযুক্তির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। উদ্ভিদের বিভাজনক্ষম অংশ কৃত্রিম উপায়ে আবাদ করে অসংখ্য চারা উৎপন্ন করা হয়। এতে এক্সপ্লান্ট থেকে ক্যালাস, মূলবিহীন ও মূল বিশিষ্ট চারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৭]*

(ক) প্লাজমিড কী? ১

(খ) জিনোম সিকুয়েন্সিং বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকের ধাপগুলির সচিত্র বর্ণনা কর? ৩

(ঘ) উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব তোমার মতামতসহ বিশ্লেষণ কর? ৪

৭। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]*

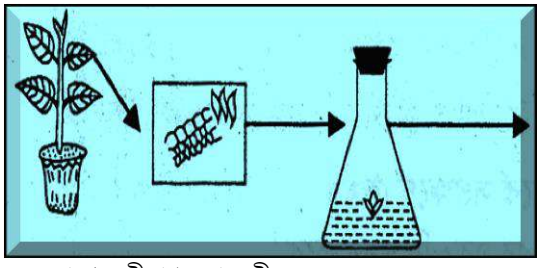

(ক) ডেঙ্গু রোগের জীবাণুর নাম কী? ১

(খ) GM খাদ্য ফসল বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) চিত্রে প্রদর্শিত প্রযুক্তির ধাপসমূহ উল্লেখ কর? ৩

(ঘ) উদ্ভিদ প্রজনন, উন্নত জাত উদ্ভাবন ও নিরোগ চারা উৎপাদনে চিত্রে প্রদর্শিত প্রযুক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর? ৪

৮। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]*

(ক) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী? ১

(খ) সোমোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) উদ্দিপকে উল্লিখিত চিহ্নিত চিত্রটির গঠন তৈরির ধাপসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। ৩

(ঘ) আধুনিক বিশ্বে উল্লিখিত ধাপটি যে প্রযুক্তির অর্ন্তভুক্ত তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৫]*

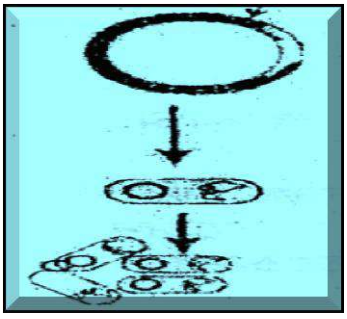

(ক) মাশরুম কী? ১

(খ) লাইটিক-চক্র বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) উদ্দিপকে উল্লিখিত চিত্রের পদ্ধতি ব্যবহার করে তুমি কীভাবে ইনসুলিন তৈরি করবে লিখ। ৩

(ঘ) চিকিৎসা ও কৃষিক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। রাজ্জাক স্যার জীববিজ্ঞান ক্লাসে দুটি প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। প্রথম প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভাজনক্ষম অংশ উপযুক্ত আবাদ মাধ্যমে নিয়ে চারা উৎপাদন করা যায়। দ্বিতীয়টির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত জিন অন্য জীবে স্থানান্তর করে উন্নত জীব সৃষ্টি করা যায়। *[যশোর বোর্ড-২০১৯]*

(ক) GM ফসল কী? ১

(খ) জীব নিরাপত্তার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রথম প্রযুক্তির ধাপসমূহ ধারাাহিকভাবে লিখ। ৩

(ঘ) কৃষি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রযুক্তিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর । ৪

১১। মানস চীন থেকে নিয়ে আসা কালো গোলাপের একটি অণুচারা থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বায়োটেকনোলজি গবেষণাগারে দ্রুত সময়ে হুবহু অনেক চারা তৈরি করে বিক্রি ও বিতরণ করে।

(ক) গোল্ডেন রাইস কী? ১

(খ) প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চারা সৃষ্টির পদ্ধতি চিত্রসহ আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রযুক্তি বাংলাদেশের কৃষির কোন ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে-বিশ্লেষণ কর । ৪

১২। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল 'রানা প্লাজা' ধসে পড়ায় অনেক গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হয় এবং অনেক নিহতের শরীর বিকৃত হয়ে যায়। ফলে তাদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। পরে জীজপ্রযুক্তির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় এরূপ বহু বিকৃত গার্মেন্টস শ্রমিককে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

(ক) আণবিক কাচি কী? ১

(খ) রিকম্বিনেন্ট DNA বলতে কী বুঝ? ২

(গ) শ্রমিক শনাক্তকারী রাসয়নিক যৌগটি কোষের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) বাংলাদেশে এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সমূহ উল্লেখ কর। ৪

১৩। আদনানের বাবা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। তিনি চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার তাকে নিয়মিত হাটতে বললেন এবং এক ধরনের হরমোন গ্রহণ করতে বললেন। হরমোনটি পূর্বে শুকুরের দেহ থেকে সংগ্রহ করা হতো, বর্তমানে এটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়।

(ক) সাইব্রিড কী? ১

(খ) জীবনিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকের হরমোন তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের বিশেষ প্রক্রিয়াটির বজ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী দেশের প্রধান অর্থকারী ফসল পাটের জিনোম আবিস্কার করেন। অনুজ বিজ্ঞানীরা তার এ আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন পাটের জাত আবিস্কার করতে পারবেন।

(ক) জিন ম্যাপ কী? ১

(খ) সিঙ্গেল কপি প্লাজমিড বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) কীভাবে উদ্ভিদের হ্যাপ্লয়েড লাইন তৈরি করা হয়। ৩

(ঘ) বাংলাদেশের এ বিজ্ঞানীর আবিস্কার মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে- ম্যল্যায়ন কর। ৪

১৫। P জিন পুষ্টির জন্য দায়ী এবং Q জিন ফলনের এর জন্য দায়ী। একটি আম পুষ্টিসমৃদ্ধ কিন্তু ফলন কম দেয়। এখন Q জিনটিকে যদি পুষ্টিসমৃদ্ধ আমে স্থানান্তরিত করা হয় তা হলে আমটির পুষ্টি এবং ফলন বেশি হবে।

(ক) ক্যালাস কী? ১

(খ) প্লাজমিডকে ভেক্টর বলা হয় কেন? ২

(গ) Q জিনটিকে কীভাবে পুষ্টিসমৃদ্ধ আমে দ্রুত স্থানান্তরিত করা সম্ভব হবে। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের Q ছাড়াও উদ্ভিদের প্রজনন সম্ভব- বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬।

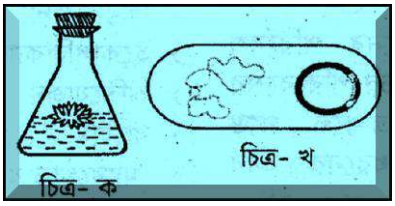

(ক) ট্রান্সফরমেশন কী? ১

(খ) GM-এর সুবিধা ও অসুবিধাসমুহ লিখ? ২

(গ) উদ্দিপকের চিত্র সমূহের মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) চিত্র খ এর সফলতায় চিত্র ক এর কোনো ভূমিকা আছে কী? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭। ড. সরকার আলুর মুকুল থেকে অসংখ্য চারা উৎপাদন করেছিলেন। অন্যদিকে ড. আলম ভুট্টার একটি নতুন প্রকরণ B সৃস্টি করলেন যাহা বিটা ক্যারোটিন ও আয়রন সৃস্টিকারী জিন সমৃদ্ধ। *[সিলেট বোর্ড-২০১৬]*

(ক) মাইসেলিয়াম কী? ১

(খ) পামেলা দশা বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত আলুর ক্ষেত্রে এটি কীভাবে সম্ভব ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে ড. আলম এর ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮। মাঠ পর্যায়ে বুনো জাত হতে কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য আবাদি জাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন সম্ভব। *[ঢাকা বোর্ড-২০১৬]*

(ক) ভিরিয়ন কী? ১

(খ) অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চল বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) বর্ণিত প্রক্রিয়াটি অর্থনীতি ও বিবর্তনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১। কোন ক্ষেত্রে জিনোম সিকোয়েন্সিং প্রয়োগ করা হয়? *[ঢা. বো. '১৯]*
(ক) আপরাধী সনাক্তকরণে (খ) পরিবেশ ব্যবস্থাপনায়
(গ) ক্যালাস সৃষ্টিতে (ঘ) হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরিতে

২। 'সাইব্রিড' শব্দটি নিম্নের কোন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত? *[সকল বোর্ড '১৮]*
(ক) গ্রাফটিং (খ) জিন ক্লোনিং
(গ) টিস্যু কালচার (ঘ) হাইব্রিডাইজেশন

৩। সুপার রাইসে কোন ভিটামিন থাকে? *[ঢা. বো. '১৭]*
(ক) A (খ) B-6
(গ) D (ঘ) E

৪। ইন্টারফেরন কোন ধরণের পদার্থ? *[য. বো. '১৬]*
(ক) প্রোটিন (খ) শর্করা
(গ) চর্বি (ঘ) গ্লাইকোলিপিড

৫। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি প্রয়োগে সৃষ্ঠ নতুন জীবকে কি বলে? *[দি. বো. '১৫]*
(ক) ট্রান্সজেনিক (খ) হাইব্রিড
(গ) সাইব্রিড (ঘ) ক্লোন

৬। নিচের কোনটি জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায় সাফল্য অর্জন করেছে? *[কু. বো. '১৭]*
(ক) হিউমুলিন (খ) ইন্টারফেরন
(গ) প্লাজমিনোজেন (ঘ) ইরিথ্রোপোইটিন

৭। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরির জন্য কালচার করা হয়– *[ব. বো. '১৬]*
(ক) শীর্ষমুকুল (খ) মূল
(গ) ভ্রূণ (ঘ) পরাগরেণু

৮। জিন প্রকৌশলে কোনটি উত্তম বাহক?
(ক) *Agrobacterium tumefaciens*
(খ) *Escherichia coli*
(গ) *Vibrio cholerae*
(ঘ) *Bacillus subtilis*

৯। Bt- বেগুন উৎপন্ন করার জন্য কোন অণুজীবটি করা হয়? *[ঢা. বো. '১৬]*
(ক) *Bacillus dysenteri*
(খ) *Bacillus anthracis*
(গ) *Bacillus thuringiensis*
(ঘ) *Bacillus denitrificans*

১০।

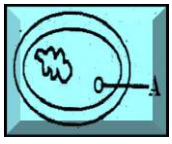

চিত্রের A চিহ্নিত অংশটি হলো– *[কু. বো. '১৫]*
(ক) ক্রোমোজোম (খ) গলজি বস্তু
(গ) নিউক্লিওয়েড (ঘ) প্লাজমিড

১১। DNA- কে খণ্ডিত করে-
(ক) লাইগেজ এনজাইম (খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম
(গ) প্রোটিয়েজ এনজাইম (ঘ) অ্যামাইলেজ এনজাইম

১২। মানবদেহের ইনসুলিন হরমোনের কাজ কোনটি?
(ক) রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা
(খ) রক্তে গ্লুকোজ পরিপাক করা
(গ) রক্তে অক্সিজেন পরিবহণ করা
(ঘ) রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করা

১৩। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়– *[দি. বো. '১৬]*
i. দেহজ ভ্রূণ
ii. হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ
iii. নতুন প্রকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

১৪। চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের টিস্যু কালচার বিষয়ক সাফল্যজনক কাজ–
i. অর্কিডের চারা উৎপাদন
ii. মুগকলাই ডালের রোগ প্রতিরোধক্ষম চারা উৎপাদন
iii. মাষকলাই ডালের রোগ প্রতিরোধক্ষম চারা উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

১৫। কৃষিক্ষেত্রে জীব প্রযুক্তি–
i. অধিক সালোকসংশ্লেষণকারী জাত উৎপাদন করে
ii. অধিক কার্বন নিঃসরণকারী জাত উৎপাদন করে
iii. অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী উদ্ভিদ উৎপাদন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

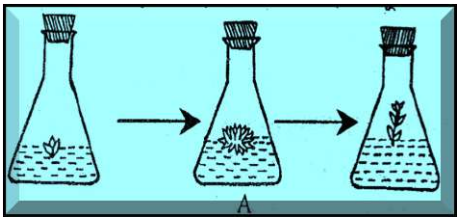

১৬। উপরের চিত্রে A ধাপে কী সৃষ্টি হবে?
(ক) মুল (খ) নতুন পাত্র
(গ) এক্সপ্লান্ট (ঘ) ক্যালাস

১৭। A ধাপের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা কত?
(ক) ১৭° -২০° (খ) ১৯° -২৩°
(গ) ২৪° -২৮° (ঘ) ২৭° -৩০°

১৮। সাইব্রিড-এর ক্ষেত্রে মিলন হবে- *[য. বো. '১৯]*
(ক) নিউক্লিয়াসের (খ) সাইটোপ্লাজমের
(গ) রাইবোজোমের (ঘ) কোষপ্রাচীরের

১৯। ইন্টারফেরন কোন ধরনের পদার্থ? *[য. বো. '১৬]*
(ক) প্রেটিন (খ) শর্করা
(গ) চর্বি (ঘ) গ্লাইকোলিপিড

২০। GMO-এর পূর্ণরূপ কী? *[সকল বোড- '১৮]*
(ক) Grnetic Modication Organism
(খ) Genetically Modern Organism
(গ) General Micro Organism
(ঘ) Genetically Modified Organism

২১। কোন এনজাইমটি DNA কর্তনের আণবিক কাঁচি? *[চ. বো. '১৭]*
(ক) রেস্ট্রিকশন (খ) পলিারেজ
(গ) লাইগেজ (ঘ) ট্রান্সক্রিপটেজ

২২। রেস্ট্রিকশন এনজাইম কী কাজে ব্যবহৃত হয়? *[কু. বো. '১৫]*
(ক) mRNA নির্দিষ্ট অংশ কাটতে
(খ) Amnmino Acid জোড়া লাগাতে
(গ) iRNA-নির্দিষ্ট অংশ কাটতে
(ঘ) DNA-এর নির্দিষ্ট অংশ কাটতে

২৩। নিচের কোনটির মাধ্যমে রোগমুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া যায়? *[ব. বো. '১৫]*
(ক) ভ্রূণ কালচার (খ) ভাজক টিস্যু কালচার
(গ) পরাগধানী কালচার (ঘ) কক্ষমুকুল কালচার

২৪। প্লাজমিড ব্যভহৃত হয়- *[রা. বো. '১৭]*
i. ইনসুলিন উৎপাদনে
ii. হ্যাপ্লয়েড লাইন উৎপাদনে
iii. GM food উৎপাদনে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

২৫। জিনোম সিকোয়েন্সি প্রয়োগ করা হয়- *[চ. বো. '১৫]*
i. অপরাধী শনাক্ত করতে
ii. ক্যালাস সৃষ্টি করতে
iii. পিতৃত্ব নির্ণয় করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *ii* ও *iii*
(গ) *i* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

২৬। টিকা উৎপাদন করা যায় কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে? *[মেডিকেল : ১৪-১৫]*
(ক) মিউটেশন (খ) জীবপ্রযুক্তি
(গ) টিস্যু কালচার (ঘ) হাইব্রিডাইজেশন

২৭। মিউটন কী? *[ডেন্টাল : ১৬-১৭]*
(ক) জিন রিকম্বিনেশনের একক (খ) জিন মিউটেশনের একক
(গ) জিন কাটার একক (ঘ) জিন প্রতিস্থাপনের একক

২৮। কোন প্রযুক্তিতে ইনসুলিন তৈরি করা হয়? *[মেডিকেল : '১৭-১৮]*
(ক) জিন ক্লোনিং (খ) রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ
(গ) টিস্যু কালচার (ঘ) এক্সপ্লান্ট কালচার

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : *[সি. বো. '১৬]*

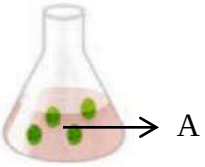

২৯। উপরের চিত্রে A-চিহ্নিত অংশটি হলো-
(ক) এক্সপ্লান্ট (খ) ক্যালাস
(গ) মূল (ঘ) কাণ্ড

৩০। টমেটো ও আরু গাছের প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন থেকে কোন নতুন গাছ তৈরি করা হয়েছে? *[মেডিকেল : '১৬-১৭]*
(ক) মামাটো (খ) পোমেটো
(গ) আমাটো (ঘ) পটোমাটো

৩১। বর্তমানে কোনটি ব্যবহার করে রিকম্বিনেন্ট DNA শনাক্ত করা যায়? *[মেডিকেল : '১৫-১৬]*
(ক) gene cloning (খ) DNA finger printing
(গ) gene therapy (ঘ) DNA probe

৩২। টিকা উৎপাদন করা যায় কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে? *[মেডিকেল : '১৪-১৫]*
(ক) টিস্যু কালচার (খ) মিউটেশন
(গ) জীবপ্রযুক্তি (ঘ) হাইব্রিডাইজেশন

৩৩। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য স্থাপন করতে হয়- *[DU : '০৭-০৮]*
(ক) sperm bank (খ) blood bank
(গ) hormone bank (ঘ) grne bank

৩৪। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মেরিস্টেম কালচার করে উৎপাদিত চারার বৈশিষ্ট্য হল- *[DU : '০৭-০৮]*
(ক) রোগ প্রতিরোধ করা (খ) রোগ মুক্ত থাকা
(গ) রোগাক্রান্ত হওয়া (ঘ) রোগ দমন করা

৩৫। বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান কোনটি? *[DU : '০৪-০৫]*
(ক) হাইড্রোজেন (খ) নাইট্রোজেন
(গ) মিথেন (ঘ) ইথেন

৩৬। প্লাজমিড DNA ছেদন করা হয়- *[DU : '০২-০৩]*
(ক) Amylase enzyme (খ) Restriction enzyme
(গ) Protease enzyme (ঘ) Cellulase enzyme

সঠিক উত্তর : অনুশীলনী-১১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ক	গ	ক	ক	ক	খ	ঘ	খ	গ	ঘ	খ	খ	ঘ	ঘ	খ	ঘ	ক	খ	ক	ঘ
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	*	*	*	*
ক	ঘ	খ	গ	গ	খ	খ	খ	খ	খ	ঘ	গ	ঘ	খ	গ	খ	*	*	*	*